প্রণতি নিবেদন

বাংলার কবি-গুরুর উদ্দেশে

—লেখিকা

আমার ডায়েরী

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" —

এই শরৎ আকাশটা দেখছি আমায় পাগল্ ক'রে তুল্‌বে! এই নিস্তব্ধ দ্বি-প্রহরে পশ্চিমের জানালা খুলে—অলসতার মধ্যে গা গড়াব ব'লে তার সাম্‌নে একটু এলাম, অমনি কতদিন আগের শোনা একটা গান আর তার সুরের প্রত্যেক মীড়, প্রত্যেক মূর্চ্ছনা ও স্পন্দন আমার প্রাণের কানের মধ্যে সে বাজিয়ে তুলে গেয়ে উঠলো,—"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" এই একটি লাইনকে কত বার কত রকমেই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগ্‌ল সে! আর আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

আজ সকালে এই 'গিরি পর্ব্বতের' দেশে যখন শারদ-ল শুভ্র মেঘের রথ ঐ "আলো-ঝলমল নির্ম্মল নীল পথ" বেয়ে চলে দেখা গেল, তখন আকাশের মাঝে পাত্‌লা পাত্‌লা মে একটা বিস্তৃত রেখা ঠিক্ যেন নদীর আকারেই তার প্রতে মেঘ-তরঙ্গভঙ্গটিকে সচল ক'রে নিজের বুকের ওপরে কা কল্পনার 'অমল ধবল' পাল্-তোলা যে নৌকাখানা ব'য়ে নি চলেছিল সে নৌকাখানার নামও বুঝি তার গায়েই লেখা ছিল তার নাম ছিল আনন্দ! আমি অবাক্-চোখে তার সে সাগর-পার-হতে-বয়ে-আনা সুদূরের-ধন-ভরা তরণীখানি বাও সারা সকাল ধ'রে দেখেছিলাম! নৌকাখানির কাণ্ডারীর মু সেই 'ছিন্ন মেঘের ফাঁকে' তেমনি অরুণ কিরণও এসে পড়েছিল সে কাণ্ডারীর নামটি হচ্ছে সুখ, আর তৃপ্তি! কিন্তু এই দুপুরে একি সুর—একি গান হঠাৎ আমার অন্তরে বেজে উঠলো গানটির আর একটু কথা আর একটু সুরও অন্তরের কানে বে গাইল!—

হে সুদূর, ওগো বিপুল সুদূর
(তুমি) বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
মোর ডানা নাই উড়িবারে চাই
সে কথা যে যাই পাশরি।

কথা ক'টির সুরে আকুল আকাঙ্ক্ষা আর গভীর হতা যেন মাখামাখি! একটি বিপুল অতৃপ্তি একটি গভীর উদাস সুরে

অন্তর যে ভ'রে উঠল!' এ অলস ভৈরবী সুর—এই উদাস হাওয়া কোথা হ'তে এল আজ? আমি তো এ'কে কখনো জানি না! আমি তো উদাসীও নই, সুদূরের পিয়াসীও নই। আমার হাতের কাছে, বুকের নীচে, চোখের সুমুখের এই যে পৃথিবী—এর সবই যে আমি বড্ড ভালবাসি। এ তো চঞ্চলা নয়, নিত্য নূতন গন্ধে বরণে গানে আমার প্রাণে প্রবেশ করতে যে তার অচল আগ্রহ। এ'কেই ভালবেসে যে আমি এখনো তৃপ্ত হইনি।

আর ভালবাসি আমি, এই সুখ-তপ্ত ধরার বুকের মাঝে স্পন্দিত নিত্য-নন্দিত আমার এই জীবনটিকে! যে এই পৃথিবীকে ভোগ করছে, দেখছে, শুনছে,—এর সর্ব্বরস অনুভব করছে। কিন্তু কে আমায় এমন ক'রে এই চরাচরকে আর সেই চরাচরকে যার দ্বারা অনুভব করছি—নিজের সেই ক্ষুদ্র জীবনটিকে এমন সুখময় অনুভূতির সঙ্গে ভালবাসতে শিখিয়েছে? কোন্ গুণী আমার সুমুখের এই ভুবনকে অপরূপের আলোয় ছেয়ে তার পাষাণ বুকে 'সুরের সুরধুনী' বইয়ে দেয়? তিনি কবি! তাঁরই কাব্য আর গান। আমার মনে হয়, মানুষ মানুষই হ'ত না যদি না জগতে কবি জন্মাতেন! এমন ক'রে মানুষের অসূর্য্যম্পশ্য অন্তরের দল স্তরে স্তরে কে খুলে দিত, যদি না কবির অনুভব কবিতা হ'য়ে গান হ'য়ে তাকে স্পর্শ করত? অন্ততঃ আমার জীবনে এ কথাটা তো সম্পূর্ণ খাটে। আমার যা-কিছু বলবার, জানবার, অনুভব করবার সবই আমি কবির

হাত হ'তেই পেয়েছি এবং এখনো সে পাওয়া ফুরোয় নি। পেতে পেতেই চলেছি, আর শেষ পর্য্যন্তও বোধ হচ্ছে তাই-ই পাব। কবির যে অনুভব ভাষা হ'য়ে সুর হ'য়ে বেরিয়েছে, তাদের নিজের তুচ্ছ জীবনে যেটুকু অনুভব করি, তারই নাম আমার এই 'ডায়েরী'। এ কেবল এই নগণ্য প্রাণের অনুভূতিকে কবিরই ভাষায় কবির গানের সঙ্গে মিলিতে দেখা মাত্র। মানুষের এই মূক প্রাণকে ভাষায়, সুরে, তালে যে অহরহ প্রতিধ্বনিত ক'রে তুল্‌ছে, তার এই শরতের, বসন্তের হেমন্তের, সর্ব্ব ঋতুর গানে আমারও এই দিন মাস বৎসর তারিখের হিসাব-হারা প্রাণ কেবল মাত্র অনুভবের ধারা ধ'রে সেই কবিরই গানের সুরের পদে পদে তাল দিতে দিতে চলেছে। এই দুদিন আগে 'ভরা ভাদরের ঝর ঝর বারি ঝরা'র মধ্যে 'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে' তাকেই নিজের চোখের সাম্‌নে যে সে নাচতে দেখেছিল! 'শ্রাবণের ঘন মোহে' সে তারই কাজল-কালো চুলের রাশ পানে চেয়ে যে সে অভিভূত হ'য়ে থেকেছে; সে দিনের নীপের-বন যে পুলকভরা ফুলে ব্যথিয়ে উঠেছিল আর নদী যে পূর্ণতার উচ্ছ্বাসে কূলে কূলে কলরোদন তুলে চলেছিল—সেও যে আমার এই পূর্ণ সুখানুভূতির অসহ্য উচ্ছ্বাস মাত্র! কিন্তু আজ আবার সেই এ'কি গান গাইলে! আজ আমি শুন্‌ছি আমার প্রাণের একেবারে কানের কাছে মুখ রেখে সেই ধরণীই গেয়ে উঠেছে "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!" সে উড়ে যেতে চায় সুদূরের কাছে—যে তাকে ব্যাকুল

বাঁশরী বাজিয়ে আকুল করছে। তার যে উড়বার ক্ষমতা নেই, সে কথা আজ তার মনে থাকছে না। আমার অচলা আজ বল্‌ছে, সে আজ চঞ্চল! সে আজ পিয়াসী!

স্থলে আকাশে এই রৌদ্রতপ্ত ধরার বুকে আজ একটা গভীর তৃষ্ণারই ইঙ্গিত যে স্পষ্ট হ'তে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিসের এ তৃষ্ণা? কিসের অভাব? ঐ যে শুভ্র নবনীর মত মেঘের চাপ্‌ তীব্রোজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, তারাও যেন ইঙ্গিতে আভাস দিচ্ছে—তারা 'জলহারা!' তাদেরও অন্তরে আজ এই তৃষ্ণার আকুলতা। দিকে দিকে তা'রাও সেই সুদূরের সন্ধানেই যেন চলেছে। আর তাদের নীচে এই শ্যামলা, উজ্জ্বলা আমার চিরনন্দিতা ধরণী সহসা যেন উদাসিনী হ'য়ে তাদের পানে চেয়ে আছে। তা'র অন্তর হ'তে সেই একই সুর বাজ্‌ছে সে পিয়াসী—পিয়াসী! সঙ্গে সঙ্গে আমারও অন্তরে আজ সেই বেদনা! এ তো শুধু আর আভাস নয়, ইঙ্গিত মাত্র নয়। এ যে একেবারে স্পষ্ট! এ যে একেবারে এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের সঙ্গেই জ্বল্ জ্বল্ ঝল্ ঝল্ ক'রে উঠলো! এই উদাসী বায়ুর মতই যে তা'র 'হু-হু'-করা নিশ্বাস আমি শুনতে পাচ্চি।

কিন্তু কেন? কেন তা ত কেউ-ই বল্‌তে পার্‌ছে না—তবু চাই—চাই! কারণ না থাক্‌লেও এই তৃষ্ণা তাদের মিথ্যা নয়! কি চায় তা'রা? সেই সুদূরকে! যাকে কখন তা'রা পায়নি এবং হয়ত চির-জীবনে পাবেও না। যে তাদের

কখন ধরা দেয়নি—কখন বুঝি দেবেও না—সেই চির অপ্রাপ্তির ধন সুদূর কে !

এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে একি মায়া-মরীচিকা আমার চির আনন্দ, চির সুখের নিকেতন ধরণীর বুকে বাসা বাঁধ্‌লো ? সে যে তা'র জলস্থল অন্তরীক্ষকে এই অকারণ ব্যথার তীব্রতায় ভরিয়ে দিয়ে আমায় সুদ্ধ পাগল ক'রে তুল্‌লো ! সুদূর কে ? সুদূর কি ? তা কেউ জানে না, তবু তাকে পেতে হবে, তবু তাকে চাই !

পত্রদিন

জগতে যত কিছু চাইবার তা'র তো আমার একটুরও অভাব নেই। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সম্পদ, আমার যথেষ্ট; বিদ্যা, বিনয়, চরিত্র সম্বন্ধেও কখনো একটা বিরুদ্ধ মন্তব্য কানে আসেনি। মোট কথা, এগুলো যতটা থাকুক বা না-ই থাকুক, অন্য কারো এই সব সম্পদের উপর একটুও ঈর্ষা কখনো ত আমার আসেনি। তা হ'লেই বলতে হবে যা আমার কাছে, অন্যের কাছে তা যতই ছোট হোক্ আমার নিজের কাছে তা পর্য্যাপ্ত। এই হ'লেই যথেষ্ট হ'ল না কি? স্নেহময় আত্মীয় স্বজনও ভগবান আমায় দিতে কার্পণ্য করেন নি। তাঁরা আবার আমার ওপরে এতটাই নির্ভরশীল যে, কখনো অধীনতার কষ্টও জীবনে আমি জানি না। সেই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কতকগুলো ছাপ্ নিয়ে বেরিয়ে এসেও আমি এখনো প্রকৃতির কাছে 'তরুণ'। বয়স খানিকটা হ'য়ে গেলেও আমি এখনো সকলেরই কাছে স্বাধীন-বালক! বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাড়ে থেকে নামিয়ে স্বদেশ-বিদেশের কাব্যকুঞ্জে সেই যে ঢুকে পড়েছি, তার থেকে আমায় টেনে বার করতে কারো এ পর্য্যন্ত সাহসে কুলোয়নি। আমায় এতটা স্বাধীনতা দিয়ে জানি না তাঁরা ভাল করেছিলেন কি আমার মন্দই করেছিলেন।

কাল হঠাৎ ডায়েরী লেখার সখ হ'য়েছে! এতদিন তো এ বালাই ছিল না! কালকের দুপুরের ঐ সুরটাই এই কাণ্ডটা ঘটালে। তারপর থেকে তা'র জের বাড়্‌তেই চল্‌লো দেখ্‌ছি। কত ছাই বালাই-ই যে এতে লিখে যাচ্ছি, এখনো আরও কত যে লিখব তা'রই ঠিক্ কি! এ এক আচ্ছা নতুন নেশায় ধরলো দেখছি। দিনকতক মাত্র বাংলা দেশ ছেড়ে এই "গিরি পর্ব্বতে"র দেশে এসেছি, এখানে প্রকৃতির এ কি উপদ্রব? স্বাস্থ্যসঞ্চয় ও নূতনত্বের আনন্দ উপভোগ করতে এসে আমার চিরদিনের আশ্রয়—আমার আশৈশব যৌবনের সাথীর এমন বেসুরো গান কেন কানে আস্‌ছে? সেও যে কি নতুন কথা আমায় বল্‌তে চায় দেখছি! কি চায় সে? কিসের তা'র অভাব? আবার সে অভাব-বোধকেও এ কি রঙিন আলোয় সাজিয়ে নতুন এক নেশার মত আমার মনের কাছে ধর্‌ছে? অন্তরের পূর্ণতার দিনেও যেমন, আজ এই রিক্ততার মধ্যে তেমনি তাকে অনুভব করবার মত্ততাও যে ক্রমে আমায় পেয়ে বস্‌ছে! এই 'সুখের ব্যথা'কে নিয়ে ব'সে নড়্‌তে চড়্‌তে উল্টে-পাল্টে দেখ্‌তেও যে বেশ লাগ্‌ছে! এ আবার কি নেশা!

কিন্তু তারও সময় বড় কম। এই দূর দূরান্তের দেশে যে আমার আত্মীয়ের মত পিতৃ-বন্ধু আছেন একজন, এ-কে জান ত? যেখানে যাই সেইখানেই আমার স্বজন! আঃ, পৃথিবীর এ দুলাল হ'য়ে যেন আর থাকতে ভাল লাগে না। একা [illegible]— মাত্র একা আমি, আর কেউ কোথাও নেই, এমন হ'য়ে

কোথাও প'ড়ে থেকে নিজেকেই বেশ ক'রে আরাম ক'রে ভোগ করি, এই যেন এখন আবার মন চায়।

কিন্তু তারও উপায় নেই। ওঁর সাদর নিমন্ত্রণ তো এসে পর্য্যন্তই অপর্য্যাপ্ত রকম চলেছে, আবার শুন্‌লাম তাঁর কন্যা বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছে, সেই জন্য কাল দুপুরেও একটা নিমন্ত্রণ! এইখানে একটু কাহিনীও আছে। পিতা ও তাঁর এই বন্ধু দু'জনে মিলে নাকি বহুদিন পূর্ব্বে এই কন্যাটিকেই আমার জন্য স্থির করেছিলেন। তার পরে আমার পিতাও গত হন এবং আমার মাথানাড়ার দায়ে আমার আত্মীয়রা এ বিষয়ে এঁকে অনেকদিনই নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছিলেন। লোকটি কিন্তু এমনি নির্ম্মল, সে সব কথা কিছুমাত্র মনে রাখেননি। আমায় পেয়েই বন্ধুপুত্রের সকল আদর প্রচুরভাবে আমায় অযাচিত দান ক'রে চলেছেন। আমারও এতদিন কিছু বাধেনি, কিন্তু আজ একটু বাধ ছিলো। তার পরে যেই শুন্‌লাম যে এ নিমন্ত্রণে তাঁর ভাবী জামাতাও উপস্থিত থাক্‌বেন, তখন সব বেশ হাল্কা হ'য়ে উঠেছে। যেতে তো হবেই। ইনি আমাদের বাঙালী, হিন্দু অথচ বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরে এই মধ্যপ্রদেশেরও সীমা ছাড়িয়ে মহারাষ্ট্রীয়দের আব্-হাওয়ায় তাদের দৃষ্টান্তে মেয়েকে এতদিন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখে এই অঞ্চলেরই মহারাষ্ট্রীয় মহিলা কলেজে এক বন্ধু-পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। মেয়েটি কয়েক বৎসরের বেশীর ভাগ সময় সেই মহারাষ্ট্রীয় পিতৃবন্ধু পরিবারের মধ্যেই পুনায় বাস ক'রে

এসেছেন। হিন্দু-সমাজ এতদূরে ধাওয়া ক'রে এসে এঁর টিকি ধর্‌তে পারেনি দেখ্‌ছি! এইবার বুঝি মেয়ের শিক্ষা শেষ করিয়ে ঘরে এনে বিয়ে দেবেন্। জামাইও ঠিক করা হ'য়েছে, শুন্‌ছি। মেয়েটির নাম শুন্‌লাম সগুণা! বা, এরা একেবারেই মারহাট্টি ব'নে গেছে বটে। কাল আর তা হ'লে মাত্র একা পিতৃবন্ধুর স্নেহের আড়ালে ব'সে হাজারো ত্রুটির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া নয়! কাল আর মাত্র সেখানে একা তিনি নন্, একটা রীতিমত পার্টিই তা হ'লে। তাঁর গৃহ শূন্য, সে জন্য রীতিমত আতিথেয়তা করতে পারেন না ব'লে তিনি একটু কুণ্ঠিতই থাকৃতেন, আজ তাই তাঁর আনন্দ মুখে চোখে ফুটে উঠ্‌ছিলো। যাক্, আমারও আর একটা দিন না হয় তাঁকে খুসী করবার জন্য গোলমালেই কেটে যাবে! কিন্তু দুপুরে নিমন্ত্রণ, আঃ! আমার এই জানালার নীচে দিগন্তের পানে তখন যে ঐ গানটি ব'য়ে চল্‌বে, "আমি সুদূরের পিয়াসী!" কতক্ষণে এসে আমি শুন্‌তে বস্‌তে পাব, কে জানে! এই দুপুরটির নেশা যে এখন আমার চিরদিনের সকাল-সন্ধ্যার উপাসনাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌লো! উপাসনাই বটে! আমি যে ভাবেরই উপাসক, আর তার উপাস্য আমার এই ধরণীর নিত্য-নব রূপরাশি! রাত্রি হ'লো, ঘুমুই এইবার।

প্রভাত

আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো,

আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো মিলালো।

সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা

যে দিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবি ভালো।

*　　*　　*　　*

তোমার আলো ভালবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে

হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো।

এই প্রকাণ্ড আকাশের তলে খোলা মাঠের বুকে এই মেঘ-মুক্ত শরতের নবরৌদ্রে উজ্জ্বল ধরণীর এ রূপ বুঝি এমনটি নৈলে অন্য কোথাও এমন ক'রে দেখা যেত না। এমন উদার শোভার জন্য এমনি বাধাবন্ধহীন অবকাশের দরকার। দৃষ্টি বাধ্ছে কেবল বহুদূরের ঐ নীল প্রাচীরশ্রেণীর গায়ে—ঐ সাতপুরা পর্ব্বতমালার অঙ্গে। আশে-পাশের কাছাকাছির এ সবুজে-ঢাকা ছোট-খাটো পাহাড়গুলি এ বাধাবন্ধহীন অবকাশের কোনই বাধা দিতে পার্ছে না।

জানি না, কবি এমনি একটা দৃশ্যের মধ্যেই এ গানটিকে রচনা করেছিলেন কি না! তাঁর 'আলোর আলো' কি তা জানি না, কিন্তু আমার আলো আমার এই জীবন!—যার প্রভায় আমি এই জগৎ চরাচরকে নিত্য ভোগ করি। আর আমার

সেই "আলোর আলো" এই ধরণীর আলো, আর আকা
বাতাস! আমার হারানো ধনকে আবার আমি এই প্রভাতে
ফিরে পাব, এ আর কাল দুপুরে মনেও করিনি। কোথায় ে
তৃষ্ণার জ্বলন্ত আলো? কোথাও না! কবির কত বাণীই ে
আজ আমার মধ্যে জীবন্ত আর সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ছে!

নীল আকাশের গায়ে এক একখানা সাদা চাদর এখানে ওখানে যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে প'ড়ে রয়েছে। দূর আকাশচারী বড় বড় পাখী দু' চারটে মাত্র আমারই মত এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে এই আলোক-ধারায় স্নান কর্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমারই মত ঠিক যার আলোর এই বিকাশ, সেই উদ্দীপ্ত সূর্য্যের দিকে পেছন দিয়ে আশেপাশের দিকে, পশ্চিমের দিকে মুখ রেখেছে, চোখ থুয়েছে। কত গানই মনে আসছে—

* * * এই মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ'পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ!
* * * তোমারি মুখ এই নুয়েছে মুখে আমার চোখ থুয়েছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

হঠাৎ মনের ভিতরটা আবার দুলে উঠ্‌লো কেন! "এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়-হরণ!"

এ কিসের প্রাপ্তির গান? কোন্ তৃষ্ণা নিবৃত্তি ...রে? কি পেলে এমন ক'রে প্রাণ ভরে?

"* * * ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ দু'হাত দিয়ে ফেল ঠেলে।"

পেয়েছি বটে, তবু একটু আবরণ ঐ যে রয়েছে। এ অতৃপ্তিটুকু মিটিয়ে যাক্, ওটুকু স’রে যাক্! আবার সেই দুপুরের সুরের আভাস—আবার সেই কথা। এই অতৃপ্তি থেকেই সেই তৃষ্ণাকে ক্রমে টেনে আন্‌বে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। শুধু এ নয়, আরও কিছু চাই, চাই।

কিন্তু সে কি? আবারও সেই প্রশ্ন!

নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে যে। আর খাতা লেখে না। উঠি!

*   *   *   *   *

এর নাম কি? এ’কে কি বলে? ওগো এ আবার কি? কেউ ব’লে দাও আমায়!

দুপুর? কখন্ চ’লে গেছে! নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এসেছি যথাকালে। সায়াহ্ন—না সন্ধ্যাও যে চ’লে যায়!

সুখ? না! দুঃখ? তাও না! তবে কি এ? না—কিছু লিখ্‌তে পার্‌ব না—পার্‌ব না!

ক’দিন কেটে গেল? দেখি হিসাব ক’রে! পাঁচ দিন? উঃ!

কিছু মনে পড়্‌ছে না এই ক’দিন কি করেছি! কেবল মনে পড়্‌ছে পিতৃ-বন্ধু এসেছিলেন! আমার পাশে ব’সে আমার হাতে একটুক্‌রো চিঠি ফেরত দিয়ে অত্যন্ত শান্ত স্নেহপূর্ণ চোখে যেন আমার মনের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, “এখন যে আর এ বদলান চলে না, বাবা, সগুণাকে হরেন্দ্রের বাগ্‌দত্তা ব’লেই জেনো।”

মনে করতে চেষ্টা করছি কি হয়েছিল! কেন? আ এখনই বা কি হয়েছে আমার? নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম তার পর? ক'জনে খেতে বসেছিলাম তাও ভাল মনে পড়ে না। হরেন্দ্রবাবু ছিলেন তো নিশ্চয়ই—আরও কে কে। গৃহকর্ত সঙ্গে বসেননি। সে তো পার্টি নয় তিনি দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিলেন আর মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় পরিবেশন করছিল তাঁর মেয়ে। মাটী উপর চালগুঁড়ি দিয়ে সুন্দর সুন্দর আসন চিত্রিত করিয়ে প্রত্যেক আসনের দুই ধারে দুইটি ক'রে 'অম্বর বাত্তি' (সুগন্ধ ধূপ-কাঠী) জ্বেলে নিমন্ত্রিতদের সেই কল্পনার আসনের উপর ছোট ছোট কাপড় পেতে বসান হয়েছিল আর প্রথমে সমস্ত খাদ্য অতি অল্প এমন কি নমুনার ভাবে পা... রেখে—পরে একে একে বারে বারে অল্প মাত্রায় গরম গরম আমাদের এনে এনে দিচ্ছিলেন। সকলেই যার যা দরকার চেয়ে চেয়ে নিচ্ছিলেন। এই নাকি এ দেশের প্রথা! (নিমন্ত্রণটা একেবারে মহারাষ্ট্রীয় অনুকরণে) আর তাতে সব চেয়ে বিপদে পড়েছিলাম আমি! এ তো বাঙ্গালীদের কখনো অভ্যাসে নাই যে, অল্প মাত্রায় পরিচিত বা একেবারে অপরিচিত স্থানে এমন ক'রে চেয়ে নিয়ে খেতে হবে! নিজের ঘরেই যে আমাদের কত পাতে প'ড়ে নষ্ট হয় ব'লে অতবার চেয়ে নেওয়ার অভ্যাস থাকে না। বে-হিসাবী বে-আন্দাজী অপচয় করার জন্য বাঙ্গালী ভোজ যে বিখ্যাত।

যাক্,—তার পরে? সকলের দেখাদেখি প্রায় ভদ্রতার খাতিরেই এটা ওটা একটু একটু চেয়ে নিয়েছি বৈকি! আর

উনি তো সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেবলই শাসাচ্ছিলেন—"পেট ভ'রে যদি না খাও, তো টের পাবে। সগুণা তুই নিয়ে আয়,—ওর কথা শুনিস্‌না—" ইত্যাদি।

তার পরে? এ সব তো সোজা কথা—এতে এমন কি হ'ল? এতদিন এতকাল পরে—আজ এই যে কাণ্ডটি কর্‌লাম সগুণার বাবাকে চিঠি লিখে,—এ কেন?

কি এমন দেখেছিলাম? রূপ? কৈ তাওতো এমন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! মনে মনে ভেবে দেখছি, অতি প্রোজ্জ্বল-সৌন্দর্য্যও কি দেখিনি কখনো? দেখেছি বৈকি! অবাক্ হ'য়ে বিধাতার শিল্পচাতুরী চেয়ে চেয়ে দেখতে হয় এমন কত 'হিমকুন্দ-তুষারাভাং' সুন্দরী, কত 'বস্‌রাই গুলে'র তুলনীয়া, কত চম্পকোজ্জ্বলা,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রূপের আলোয় চোখে ঠিক ধাঁধা ধ'রে যায় এমনও কত যে দেখেছি। আমারই জন্য শুনেছি দেখেছি এমন কত, যারা সগুণার চেয়ে—লিখতে পার্‌লাম না আর। কি লিখ্‌ছি নির্ব্বোধের মত,—'কার' নাম নিয়ে বার বার কিসের তুলনা কর্‌ছি? রূপ? মানুষের এই কদর্য্য অসার বহিরাবরণ—যা দিয়ে আসল মানুষটাই চিরদিন ঢাকা প'ড়ে আছে, তাই দিয়েই তা'র তুলনা? ছি ছি, এর চেয়ে মূর্খত্বের পরিচয় আর নেই!

তবে কি গুণ? তাই বা কি ক'রে বলি? কি জানি তা'র আমি, কতটুকু পরিচয় জানি তা'র? না না, এও না।

বিদ্যা? তুলনা আর কর্‌ব না—তবু বুঝ্‌ছি তাও নয়।

এই তুলনা জিনিষটাই কি বিশ্রী! এই ক'টা কথা লিখ্‌তে মনটা কি বিকৃত—কি পঙ্গু, কি সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠছে! পৃথিবী আছে কি কেবল রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধির বিচার মাত্র? এ তুল-দাঁড়িতে তুলে সব জিনিষকে বুঝে নিতে হবে? এতে জিনিষের মূল্য ঠিক্ হবে? হায় রে—তাই যদি হ'ত তাহ'লে আর তা'র মধ্যে 'অতুল্য' 'অমূল্য' এ কথাগুলো থাক্‌তো না আর পৃথিবী তাহ'লে কি দরিদ্র, কি হীনই না হ'য়ে দাঁড়াত জগতের কাছে? তুলনার আভাস পর্য্যন্ত যার পায়ের কাছে পৌঁছুতে পারে না—এমন কিছুও আছে গো এই পৃথিবীর মধ্যে

তাহ'লে কি একেবারেই অকারণ? সম্পূর্ণ অকারণেই মনের এই কাণ্ড? মন যে একেবারে লাফিয়ে উঠে অন্তরের মুখ থেকে এই কথাটি ছিনিয়ে নিচ্ছে! অকারণ! হ্যাঁ, এ অকারণই! যেমন অকারণে সেদিন আমার চিরস্থিরা চির-সুখময়ী পৃথিবী সহসা জেগে গেয়ে কেঁদে উঠেছিল "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!" তেমনি, ঠিক্ তেমনি ক'রেই!

লজ্জার ধাক্কাটাও কেমন ক'রে সাম্‌লাতাম জানি না যদি না পিতৃবন্ধু আমার ঐ কথাগুলার পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে আমায় একটু প্রকৃতিস্থ ক'রে রেখে না যেতেন! তারপরেও প্রত্যহই আসেন এবং ও কথাটা যে আমি কখনো তাঁকে বলেছি এমন একটু আভাসও আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন না। যেন কিছুই [illegible]নে এমনি-ভাবে প্রত্যহ আমায় তাঁর বাড়ী গিয়ে হরেন্দ্র আর সগুণার সঙ্গে

ভাল ক'রে আলাপ কর্‌তেও বলেছেন, কিন্তু আমি—কি জানি পার্‌ব কি? অন্ততঃ এখনি? না, পার্‌ব না। আগে নিজের কাছেই নিজের লজ্জাটা ভুলে নিই।

মাত্র কদিনের একটা প্রবল ইচ্ছা, নিশ্চিত-প্রাপ্তি-সম্ভাবনার একটা উত্তাল আশা, তারই নিরাশার আঘাতে এতখানি বেদনা? পাবে না, আর পাবে না; মিথ্যা, মিথ্যা সব। যে দিন হেলায় হারিয়েছ আর তা প্রাণপণ করলেও তোমার হাতে আস্‌বে না। যা অনায়াসে পেতে, আজ তা তোমার পক্ষে সুদূরের চেয়েও সুদূরের ধন—দুর্লভ হ'তেও দুর্লভতম বস্তু। যা তুমি হারালে এর কাছে তুচ্ছ তোমার জীবন—তুচ্ছ তোমার সব—তুচ্ছ তুমি! অন্তরের ভেতর অন্তর লুকিয়ে প'ড়ে কেবল এই কথাই বল্‌ছে যে! এর এ ব্যথা নিবারণ করবার মত আজ আর হাতে কোন সম্বলই যে পাচ্ছি না। তবু চিরদিনের জায়গাটিতে আসন পেতে পৃথিবীর মুখের দিকে চাইছি, কই গো আমার অম্লান প্রভাতের আলোর আলো—কোথায় তুমি আজ? কেন আমার এই সহসা অন্ধকারময় চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে পার্‌ছ না? আজ সে আলোর দলগুলি কেন খুল্‌ছে না? সেই সোনার কোষের মাঝখানে মুখ লুকিয়ে কে ও আজ! আনন্দের সিংহাসনে আজ কে এ, এ তো আমার সেই "সুখের মত ব্যথা" নয়! এ যে একেবারে জীবন্ত, জ্বলন্ত! কি তীব্র—কি উদ্দাম এ বেদনা! এর নাম কি, কে বলে দেবে আমায়?

আমি না সাড়ম্বরে লজ্জা ভুল্‌তে বসেছিলাম? কিসে লজ্জা? কে পেয়েছে? কিছু না! কি তুচ্ছ এ লজ্জার কথ নিজের এতদিনের জীবনটাই যেন একেবারে ধোঁয়ায় মিে গেছে! সমস্ত আকাশ বাতাস চরাচর জুড়ে যা আজ একার সত্য হ'য়ে উঠে আর-সবকে একেবারে মিথ্যায়, একেবারে তুচ্ছত্বে পরিণত ক'রে দিচ্ছে তার একটি মাত্র নাম—বেদনা—বেদনা! লজ্জা বা ঐ রকম একটু কিছুর স্থান থাক্‌লেও তো বাঁচতাম!

সন্ধ্যার দুয়ারেও ভিখারীর মত বসেছি। আকাশেও দেখি সেই নিরুদ্দেশ যাত্রা! সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা ক্রমে নিভে এলো দেখ্‌ছি—

সেই—

—ঘননীল নীর,
কোন দিকে চেয়ে নাহি দেখি তীর
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।
"এখন বারেক শুধাই তোমায় স্নিগ্ধ-মরণ আছে কি হোথায়?"

কা'কে এ প্রশ্ন কর্‌ছি? আমার যে এমনি হয়েছে এ জগতের কে জানে? কেউ না—কেউ না! জগৎ না জানুক কোন দুঃখ নেই, বরং না জান্‌লে বাঁচি। কিন্তু ওগো তুমিও একবার জান্‌বে না? এ কথা তুমিও যে জান্‌তে পার্‌লে না এ দুঃখ কেমন ক'রে সইব? কিন্তু জানাতেও তো কখনো পার্‌বো না—এওতো নিশ্চয়।

রাত অনেক, সদ্যোগত বর্ষার এই ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ছাতের উপরই কি পড়েছিলাম? এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখছি নক্ষত্রদের চোখ তো জ্বলছে! তারা আমার এই কাণ্ড দেখেছে মনে করে একটু লজ্জার সঙ্গেই একটা উদ্দাম নিশ্বাসকে যে রোধ করতে পারছি না! নক্ষত্রদেরও তো আমি জানাতে যাই নি, কিন্তু তারা কেমন ক'রে সব টের পায়? এমনি ক'রে কি সে চোখের আলোও আমার এই দুর্ভাগ্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে—

কি করছি, কি লিখছি পাগলের মত। এই এক জ্বালা—এ কি লেখার নেশায়ও ধরেছে। সেদিন দুপুর থেকে এই এক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেদিন কি স্বপ্নেও জেনেছিলাম যে আমার এই ভাবচর্চ্চা শেষে নিজের জীবনের কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে?

পরদিন—উষা

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আত্মচৈতন্য না কি যাকে বলে—তিনি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যের সেই ধ্বক্ ধ্বক্ সুরু হ'য়ে গেছে। শুধু এই কি? বেশ মনে পড়ছে, গভীর ঘুমের পরে জেগে উঠে যেমন সেই সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়ও "আমি যে ছিলাম" এই স্মৃতিটা মনে আসে, তেমনি মনে পড়ছে, সেই "আমি আছি"র সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বক্ ধ্বক্, এই ব্যথা এসে সমানভাবে নিজেকে গভীর ঘুমের মধ্যেও জানাচ্ছিল! "সব যাওয়ার পর" মাত্র যিনি থাকেন, তাঁরই সঙ্গে সমানভাবে নিজের অস্তিত্ব জানায়, এমন কে গো আজ আমার মধ্যে উদয় হলেন? কে ইনি? আর কি করব আমি এঁকে নিয়ে?

বেদনা, বেদনা! এর নাম কি সত্যই এই? তবে ত জীবনই একটা বেদনা! এই যে আমি—এই যে আমার অস্তিত্ব এও ত বেদনা ছাড়া আর কিছু নয়! এই বেদনা ভিন্ন আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর টেরই পাচ্ছি না ত?

বুকের মধ্যে অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে অন্ধকারে যেন সমুদ্র উথলাচ্ছে! ঠিক্ তেমনি! সেই গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ—গুমরে-মরা বেদনায় অব্যক্ত আর্ত্তনাদ—আর আছাড়ি পিছাড়ি! অন্তর সভয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, "কে এ? কি এ? কার

এ আবির্ভাবে এখানে এমন অভাবনীয় অচিন্তনীয় সংঘর্ষ?"
কে দিবে উত্তর! কিন্তু 'ভয়ে' যে সে সারা হ'ল।

ওগো যেই হও তুমি, আর যে পারি না!—অভয় দাও—অভয় হও।

কেনই বা নিজে এত প্রচণ্ড বেগে কাঁপ্‌ছ—আর জল, স্থল, অন্তরীক্ষকেও কাঁপিয়ে মার্‌ছ? তোমার এই প্রচণ্ড আবির্ভাবের ধরণেই যে বুঝ্‌ছি, তোমায় পরাজিত কর্‌বার মত শক্তিমান্ এখানে কেউ নেই। যদি এমনি তুমি হও—তা হ'লে অনুপায় গতিহীন আমাকেও তোমার পায়ের তলায় স্থির হ'তে দাও, নিজেও হও! রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও! প্রসন্ন হও গো—আর যে পারি না।

দুঃখের মধ্যেও হাসি,—কিছু দিন আগে একখানা 'পদাবলি' দেখেছিলাম। পূর্ব্বরাগের গাথায় তার এই ক'টা ছত্র হঠাৎ মনে এল—

"রাই কহে কে বা হেন মুরলী বাজায়
যেন বিষামৃতে একত্রে করিয়া,
অস্ত্র নহে, মন ফুটে কাটারীতে যেন কাটে
ছেদন না করে মোর হিয়া।
জল নহে, হিমে জনু কাঁপাইছে মোর তনু
শীতল না করে হিয়া মোর :
তাপ নহে, উষ্ম অতি পোড়াইছে মোর মতি
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর।"

এমনি সব পরস্পর-বিরোধী কথা! তখনও হেসেছিলাম কিন্তু সে এক রকমে। আর আজ দুঃখের হাসি হেসে বল্‌ছি আচ্ছা, বিষ মান্‌ছি, কিন্তু অমৃত কৈ? বিষামৃতে একত্র শীতলতার সঙ্গে অগ্নির দাহিকা শক্তি,—কৈ, তা তো মিল্‌ছে না!—আমি যে দেখ্‌ছি শুধুই বিষ—শুধুই অগ্নি! দুদিন আগেও যে জীবনের সত্তার অনুভবকে আনন্দ ভিন্ন আমার অন্য কিছু মনে হ'ত না, তাকে এমন অগ্নিময়—বিষময় কিসে ক'রে দিলে?—ওঃ—আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কি কিছু জগতে আছে?

* * * *

আছে আছে, অমৃতও আছে, শুধুই বিষ নয়।

ক'টি হাতের-অক্ষরে একটুক্‌রো চিঠি—এতেই কি আজ এই অমৃতের স্পর্শ আমায় এনে দিলে? বার বার অক্ষর ক'টি কেবল প'ড়েই যাচ্ছি—ক্রমে মাথায় যেন শব্দের আর অর্থবোধ-জ্ঞানও রইলো না। হাতে থেকে থেকে কাগজখানাও মলিন হ'য়ে কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে গেল। মাথার ভেতরে কেবল সেই সুন্দর ছাঁদের হরফ্‌গুলিই যেন সোনার অক্ষরে ছাপা হ'য়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌তে লাগল! কথা ক'টি কিন্তু এই—

"বাবা আপনাকে লিখ্‌তে বল্লেন, তিনি প্রত্যহ বৈকালে আপনার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন, আপনি কেন আর আসেন না? তাঁর আজ একটু জ্বরভাব হয়েছে, যদি পারেন,

আজ একবার আস্‌বেন। আমরা আপনার অপেক্ষায় রইলাম। আমার প্রণাম জান্‌বেন—ইতি।—সগুণা।"

বৈকাল হ'তে ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে গেল, সব ভুলে কেবল এই স্বাক্ষরটিই শেষে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে চম্‌কে উঠ্‌লাম—যেতে হবে যে!

দাঁড়াতে গিয়ে বুঝ্‌লাম, আজ মাথার পক্ষে এর বেশী আর সইবে না। যথাস্থানে ব'সে প'ড়ে এইবার চোখ বুজতেই হ'ল! যেতে পার্‌ব না।

পরদিন

কি লিখ্‌ব, আজ্‌কের কথা বুঝতে পার্‌ছি না। খানিকক্ষণ হ'ল পিতৃবন্ধু নিজেই এসেছিলেন তাঁর কন্যাকে সঙ্গে ক'রে। আমার যাবার অপেক্ষাও আর ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি।— আমার এই নিঃসঙ্গ স্বভাবকে কিছুতেই নাকি তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। সাধারণ সামাজিক মানুষ নাকি আমায় হ'তেই হবে। পিতৃবন্ধু আমায় যথেষ্ট তিরস্কার কর্‌ছিলেন আর তাঁর কন্যার সদয় স্বর মাঝে মাঝে কানে গিয়ে আমায় যেন আরও অসংযত ক'রে তুল্‌ছিল! তার এই দয়াটুকু, আমার ত্রুটিটা ঢাক্‌তে তাঁর এই স্ত্রীজাতিসুলভ সৌজন্য, সেটুকুও যেন আমায় আরও বিবর্ণ ক'রে কাঁপিয়ে—চোখে জল ভ'রে এনে দিচ্ছিল! কি ক'রে সাম্‌লেছি—এখন মনেও করতে পার্‌ছি না। কথা ক'টি ঐ লেখা ক'টির মতই কানে লেগে আছে। "বাবা, ওঁর শরীর হয় ত ভাল নেই—দেখ্‌ছেন না! কেন অত বক্‌ছেন?"

তার পরে আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন, "বাবার স্বভাব এত দিনে চিনেছেন, বোধ হয়। আমার যদি চিটির উত্তর দিতে একদিন দেরী হয়, তা হ'লে বাবা এমন ব'কে ত চিঠি লিখতেন না। তার চেয়ে একটু বেশী দোষ হ'লে ত— আর রক্ষেই থাক্‌ত না; একেবারে পুনায় উপস্থিত হ'য়ে সে[illegible] এক-বাড়ী লোকের আর সহপাঠীদের সাম্‌নে এমন ক'রে বক্‌বেন

যে, আমায় কাঁদিয়ে না দিয়ে রেহাই দেন না। আপনার ওপরও ঠিক্ তাই ধরেছেন দেখ্‌ছি।"

না গো, আমায় এই সাধারণ সহৃদয়তাটুকুও দিতে এসো না, এটুকুও সহ্য করবার শক্তি নেই যে দেখ্‌ছি আমার। করুণ সুরটুকু কানে গিয়েই যে চোখে জল ভ'রে এনে দিচ্ছে। যদি সেটুকু বাইরেই ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে?—না গো না—দিও না।

স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি। যা'কে মন বলে, সেই গহন গভীর অতলের একেবারে কাছে পৌছুতে ইচ্ছে কর্‌ছে! কি সে বস্তুটি, আর তার অনুভব নামে জিনিষটাই বা কি! ভাবতে ভাবতে একটা কথা হঠাৎ মনে এল! যার নাম গান, সেই বা কি জিনিষ? কবির লেখা কতকগুলা কথার সমষ্টি, তাই ছন্দে লয়ে কখনো টেনে কখনো আল্লা দিয়ে চড়িয়ে নামিয়ে কাঁপিয়ে সেই কবিতার আবৃত্তি ক'রে যাওয়া—এরই নাম কি গান? এ কথা যে-কোন সঙ্গীত-শ্রোতার কাছে বল্‌লেই সে নিশ্চয়ই হেসে উঠ্‌বে। গানকে প্রকাশ করবার সাধ্য ভাষার কি থাকা সম্ভব? সে কেবল গায়কের প্রাণ জানে আর শ্রোতার কান জানে আর মন জানে। ভাষা মাত্র এইটুকু বল্‌তে পারে—

"কি যে শুনি তাহা কে বা জানে।"

এই মনকে আর তার অনুভবকে বুঝ্‌বার চেষ্টা এও কি তেমনি নয়? কেবল সেই একটা 'গান'ই চারিদিকে ধ্বনিত হ'য়ে

চলেছে যেন! ভাষা নাই, কেবল একটা সুর! বাঁশীর
বেহালা সেতারের ভাষাহীন রাগিণীর আলাপ মাত্র! তা
কত মূর্চ্ছনা মীড় মেশানো—সুখের দুঃখের। আর কে
কিসের একটা—"ছায়া দোলে ছায়া দোলে,—দিবানিশি ধরি
রাত্রি এসেছে। অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে একটি লাইন—

"আঁখি হ'তে ঘুম নিল হরি, কে নিল হরি! মরি মরি।"

রাত্রি—দ্বিপ্রহর

আমি ক্রমশঃ আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি, এই দেখে যে, কবির যত গান, তা কি আমারই জন্যে তৈরী হয়েছিল! আমার এই জীবনের খাতায় যে তাঁর কোন গানটিই বাদ্ যাচ্ছে না। সবই যে একে একে দিনে দিনে ক্রমশঃ একেবারে সত্য হ'য়ে দেখা দিচ্ছে। এ তো গান শোনা নয়, কাব্য পড়াও নয়; এ যে একেবারে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব। জীবনটা কি? একটা অনুভবের সমষ্টি বই ত নয়। অস্পষ্ট হ'তে ক্রম-পরিস্ফুট এই অনুভবের স্মৃতি-ধারাই ত মানুষের জীবন। আবার সেই একটানা জীবনস্রোত যেদিন একটা প্রবল অনুভবের বেগে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে—তারই নাম ত প্রাণের জাগরণ! আমার এই যে খাতা, এ ত তারই অভিব্যক্তি মাত্র। তাই আমার জীবনের প্রতি অভিব্যক্তির মধ্যেই কবির গানের এই আশ্চর্য্য মিল দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছি। কিংবা এ বুঝি বিশ্বেরই একটা চিরপরিচিত চিরপুরাতন পরীক্ষিত সত্য,—বিশ্বকবি তাই-ই গেয়ে গেছেন। আজ আমার এই নগণ্য জীবনও সেই সুরে সুর মিলালো। বিশ্ব-সমুদ্রের অগণ্য প্রাণ-তরঙ্গের মধ্যে আজ আমিও একটা ঢেউ জাগালাম এই মাত্র। কিন্তু একটা হাসির কথা, আমার জীবন যে ক্রমশঃ কবির একটা গানের বইয়ের কপি হ'য়েই দাঁড়াচ্ছে! হোক্, তবু আমার এই

জাগ্রত জীবন্ত সত্যকে ত আমার নিজের চোখের সাম্‌নে একবার নিজের হাতে রেখা টেনে দাঁড় করাতেই হবে,— নৈলে স্বস্তি কোথায় !

"বিশ্ব যখন নিদ্রা-মগন
গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার !
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে—"

ওগো, এ কি 'তারে তারে' ঝঙ্কার দেওয়া ? এই স্তব্ধ রাত্রিতে এই বিনিদ্র নয়নে শয়ন ছেড়ে ব'সে আছি ! নয়নের ঘুম কেড়ে নিল কে এমন ?

"গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে
জানি নে কোন্ বিপুল বাঁশী—
বাজে ব্যাকুল সুরে !"

তার একটি মাত্র ভাষা—"ভালবাসি—ভালবাসি !"

"কোন বেদনায় বুঝি না রে হৃদয়ভরা অশ্রুভারে
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার !"

সত্যই এ কোন্ বেদনা, তাও কি বুঝ্‌ছি না ? তাকে যে জীবনে আমার এ 'কণ্ঠহার' এই আমার সদা-জাগ্রত ভালবাসার আভাসটুকুও জানাতে পাব না, এই যে এ বেদনার স্বরূপ ।

নতুন ক'রে—নতুন আগ্রহের সঙ্গে আবার কবির গীতি-কাব্য পড়ছি। এত দিনও ত পড়েছি, অনুভব করেছি, তন্ময় হয়েছি, এই সেদিনও ত কত লিখেছি, কত ভেবেছি। কিন্তু আজকের এ অনুভবের সঙ্গে তাদের কি তুলনা হয়? জগৎকেও আজ এ কি নতুন চোখে দেখছি। বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বকাব্যও যেন তার ধারা বদলেছে। জীবনে এমন নতুন নতুন অনুভব মানুষের কত বারই না জানি আসে? এ অশেষ কি এমনি ভাবেই চলে? এর কি শেষ নেই? এত দিনের অনুভব—সেও তো আমার কাছে তুচ্ছ ছিল না। কিন্তু আজ—ওগো, আজ যে সে আনন্দের কোথাও আভাস নেই! কেবল বুঝতে পারছি—

> "তুমি বড় বেদনার মত বেজেছ হে আমার প্রাণে,
> প্রাণ যে কেমন করে মনে মনে মনই জানে।"

প্রকাশ করবার কোন ভাষা নেই—ভাষা নেই! সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা প্রচণ্ড ভয়!—

> "এ জনমের মত আর হয়ে গেছে যা হবার
> ভেসে গেছে প্রাণ মন মরণ-টানে।"

সত্যই কি এ জন্মের মত যা হবার হ'য়ে গেছে? প্রাণ মন এই যে মরণস্রোতে ভেসেছে, এ থেকে কি আর সে কূলে উঠবে না? এই কূলে ওঠারই বা অর্থ কি? যা এ জীবনে হবার নয়, পাবার নয়, তা ত হবেই না—পাবই না, তা-

হ'লে এর অর্থ এই নয় কি যে, তাকে ভুল্‌লেই—এই ব্যথাকে ভুলতে পার্‌লেই এ স্রোতের গতি ফির্‌বে ?

না না না ! এ কথা চিন্তার পর্য্যন্ত যখন শক্তি নেই, সাহস নেই, তখন মিছে এ কূলে ওঠার জন্য হাঁকুপাঁকু কেন ?—

"এ জীবনের মত আর হয়ে গেছে যা হবার"

বড় বেদনার মতই সে আমার প্রাণে বেজে থাক্‌। এ ব্যথাকে আমি ভুল্‌তে চাইনে—চাইনে ! আমার এই জীবনের অনুভবের মধ্যে সে কোন দিন থাক্‌বে না—এ কথা ভাবতেও যে পারি নে ! তা হ'লে আমার কি থাক্‌বে ? "যেখানে ব্যথা সেখানে তোমারে নিবিড় করিয়া ধরিব হে।" এই-ই আমার সুখ, এই আমার দুঃখ আর "সব সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন।" কবি যে বলেছেন—"বড় সুখে বড় দুঃখে আমি তোমা পানে আছি জাগি !" এ কথা এ ত সত্য ? এই অপরিসীম দুঃখের মধ্যেও যে কতখানি সুখের নেশা লুকান আছে, তা এই ব্যথাকে ভুল্‌বার অনিচ্ছাতে আজ ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারলাম।

পরদিন

* * * *

নয়ন আলস মুছি কমল-করে

শিয়রে দাঁড়ায়ে নিশি-শেষে।

স্নেহ-কনক-লেখা-মুকুলিত নয়নে

চরণে অরুণ পরকাশে।

অঞ্চল বিজন চঞ্চল বায়,

কোকিলকণ্ঠ পঞ্চম গায়,

মৃদু হাসি কুসুমে বিকাশে।

স্নিগ্ধ সুন্দর শান্ত মনোহর নমো নমঃ প্রভাত-প্রকাশে।

এ ঊষা-রূপিণী কে? যে আজ চোখ্ খুল্‌তেই মনের চোখের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে এ গান আজ আমায় গাঁথালে! স্নেহ-কনক-লেখা তার নয়নে আঁকা! কাল যে স্পষ্ট তা অনুভব কর্‌লাম। মৃদু অনুযোগের সঙ্গে কথাগুলি এখনো যে কানে বেজে চরাচরকে যেন মধুরতায় ভরিয়ে দিচ্ছে।

"বাবা আপনার জন্য ভারি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। সত্যই আপনি দিন দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছেন! এসে যে প্রথমে আপনার চেহারা এর চেয়ে অনেক ভাল দেখেছিলাম। শুধু কোণায় একা একা ব'সে থেকে থেকে আপনি শরীরটাকে মাটী কর্‌চেন্!"

কি উত্তর দিতে পারি এর? তার পরেও সগুণা বলেছিলেন—"পুনায় থাকৃতে বাবা আমায় কত লোভ দেখিয়ে লিখতেন, বাড়ী এলে কেমন একজন সঙ্গী পাবি, কত নতুন নতুন গল্প শুন্‌বি, নিজেদের দেশের কথা জান্‌বি। কিন্তু আপনি যে আমাদের সে আশাটা এমন মিথ্যা ক'রে দেবেন, এ কিন্তু একবারও আমাদের মনে হয়নি।" কি উত্তর দিয়েছিলাম এর, মনে নেই, কিন্তু তার কথাগুলি ত মনে বেশ আছে।

"সব আপনার মিথ্যা কথা! ইচ্ছে ক'রে আপনি আমাদের বঞ্চিত করছেন! সেদিন গান গাইতে বল্‌লাম, তাতে বলেছিলেন অন্য একদিন গাইব। সেদিনই যে কবে আস্‌বে তা তো বুঝছি না।" তার পর কি অনুনয়ের সহিতই সগুণা আমার দিকে চেয়ে অনুরোধ করলেন, "আমার সঙ্গে একটু একটু বাঙ্গলার চর্চ্চা ক'রে আমায় বাঙ্গালীর মেয়ে ক'রে নিন। আমি যে কিছুই জানি না। যখন দেশে যাব, তখন কত লজ্জা পাব ভাবুন ত! তখন কিন্তু আমার আপনাকেই দোষী ব'লে মনে হবে। আমি বাবার কাছে শুনেছি, আপনি বেশ ভাল বাঙ্গলা রচনা করতেও পারেন।"

আমি এ-কথার প্রতিবাদ করলেও সগুণা বলেছিলেন, "আমি ত আপনারই রচনা এখনি শোন্‌বার জন্য জেদ করিনি। সে যত দিনে আপনি আমায় শোনাবার ইচ্ছা করবেন, তখনই না হয় শুনব. কিন্তু এখন দেশের কবিদের সঙ্গে আমায়

আগে পরিচয় ক'রে ত দিন্! শুনছি বাঙ্গলায় খুব ভাল ভাল গান তৈরী হয়, কিন্তু হরেন্দ্রবাবু মাত্র বাবাকে এই খবরটুকুই দিয়েছেন, এর বেশী আর কিছু দিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। এখন আপনার কাছ থেকে আমরা সে-সব আদায় কর্‌তে চাই। আপনার যদি প্রথমে গান গাইতে লজ্জা হয়, তা হ'লে বলুন, আমি দু' একটা মারহাট্টি 'ভজন' শুনিয়ে দিই।"

এ সুযোগও ছাড়িনি এবং তার পরে নিজেকেও গান গাইতে হয়েছে। কি যে গেয়েছি, তা মনে কর্‌তেও হাসি পাচ্ছে। কি গানই বা গাইতে পারি! যারা আজকাল আমার অন্তরে দিনরাত গুঞ্জরণ কর্‌ছে, তাদেরও কি ঠোঁটের আগায় আন্‌তে পারি তাঁরই সুমুখে? পারি না, পার্‌ব না! তাই গেয়েছি কবির শুধু বাঙ্গলারই বন্দনা-গান! আমার সুরে না হোক্, কবির দক্ষতায় দেখ্‌লাম, সগুণা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে গেল। হরেন্দ্রও এসে জুটেছিলেন সেদিন। সগুণার বাবা ত বরাবরই ছিলেন। সকলেই খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন দেখলাম। বিদায়ের সময় সগুণার নিবেদন পেলাম, আমাকে এখন তাঁদের বাঙ্গলা গান কিছুদিন ধ'রে শোনাতে হবে, পরে সে নিজেও গাইতে শিখবে, এই তার ইচ্ছা।

তোমারই কাছে প্রত্যহ আমার গান গাইতে হবে? জান না, তাই ঐ অনুরোধ করেছ। কি গাইব—কোন্ গান গাইব আমি? যা গাইতে যাই, সবই যে আমার এখন নিজের কথায়—নিজের ব্যথায় ভরে' উঠে! যদি এর একটুও বুঝতে

পার—কিংবা অন্য কেউ পারে, তখন কি হবে? কি ভাব্‌বে—কি বল্‌বে তখন আমায়? এটুকুও যদি তাতে হারাই? না না, গান গাইতে আর পার্‌ব না। কিন্তু আজ এ প্রভাতটিকে আমার শত শত নমস্কার। আর আজকে যার ঠিক চরণমূলেই আমার আনন্দ-অরুণোদয় হচ্ছে ব'লেই অনুভব কর্‌লেম, আমার সেই উষাময়ীকেও উদ্দেশে শত শত প্রণাম। এইটুকুতেই —ওগো এইটুকুতেই যে আমার প্রাণ আজ ভরে' উঠেছে! আবারও তোমায় প্রণাম করি, দেবি!

এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, পিতৃ-বন্ধু আমার লজ্জাটুকু সংবরণ ক'রে নিয়েছেন। সগুণা কিছুই শোনেনি। জানি না, আমার পক্ষে এটুকু সুখের কথা কিংবা কি?

এও যেন একটা দ্বন্দ্বের বিষয়! সগুণা এর যে একটুও কিচ্ছু জানে না, এ কি আমার পক্ষে এতই খুসীর বিষয়? কিন্তু জান্‌লে যে আর একদিনও আমায় এমন ক'রে এদের পাশে এখানে থাকা চল্‌তো না। সগুণা এই যে তার বাপের স্নেহে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পিতৃ-বন্ধুর ছেলে ব'লে আত্মীয়ের মত ব্যবহারে চল্‌ছেন—এই অকুণ্ঠিত ভাব কি সে-কথা জান্‌লে থাকত? এই স্নেহটুকু হাসিটুকুর সঙ্গে বুঝি খানিকটা সৌহৃদ্য আমি পাচ্ছি— এ কি আর পেতাম? খুব সম্ভব আর পেতাম না! কিছু না কিছু কুণ্ঠা আস্‌তই। আর পিতৃ-বন্ধু? তিনিও মনের মধ্যে বোধ হয় একটু আঘাত পেয়ে স্নেহটা পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণই ক'রে ফেলেছেন। এই সরল মানুষটি বোধ হয় ভেবে নিয়েছেন, যা

অসম্ভব, তার জন্য মানুষ কি আর মাথা ঘামায়? ব্যাপার বুঝবার সঙ্গেই মানুষ তার থেকে মনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য, এবং এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তাই হয়েছে।

দুনিয়ার এই এক মজা! যেখানে যত বাধা, যত বিফলতা, সেইখানেই মানুষের মনের তত ঝোঁক—তত আছাড়ি-পিছাড়ি। এ রহস্যের অন্ত কে জানে!

দুই দিন পরে

প্রতিজ্ঞা তো রাখ্‌তে পারলাম না। গান গাইতে হ'ল তো আজও। তিন জনেরই একান্ত অনুরোধ—কত আর ঠেলা যায়। কি সন্তর্পণে কত বেছে বেছে ভয়ে ভয়ে গাওয়া,—সে কি ভাল হয়? সগুণা কেমন ক'রে এও ধর্‌তে পারলেন, এই-ই আশ্চর্য্য! স্পষ্টই বল্লেন, "আপনি বড্ড বাছাই ক'রে ক'রে যেন ভেবে ভেবে গান গাইছেন! ওতে কি ভাল হয়! প্রাণে প্রথমেই যে গানটা ওঠে, সেইটাই গানের মুখের উৎস খুলে দেয়। আপনি সেই উৎসকেই যেন বরাবর চাপা দিয়ে চলেছেন।"

তা না দিয়ে আমার উপায় কি? আমি যে গানই গাইতে যাই, তাতেই যে আমার নিজের সুর বেজে ওঠে, অমনি ভয়ে চম্‌কে তাকাই—কি কর্‌লাম বুঝি! কবি তাঁর প্রাণের অধীশ্বরের উদ্দেশে যা নিবেদন ক'রে গেছেন, তা যে আমার প্রাণে, আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠান ক'রে আজ আমারই উপাস্যের উদ্দেশে ছুটে চলেছে। যাকে ছুঁতে যাই, তাতেই এই বিপদ ঘটেছে।

বেশী দিন এই ভাবে আর তো বাছাই করাও চল্ল না। ক্রমে শুধু গান গান—আর গান, এ ছাড়া আর তো কিছু মনে থাক্‌ছে না! ভয় নয়, লজ্জা নয়, সন্দেহ নয়, বেদনা ।। কেবল গেয়ে যাই—যা মুখে আসে, মনে আসে। কেবল একটা কাজ করি, চোখ চেয়ে বা কারু দিকেই ফিরে চাই না। শ্রোতাদের

দিকে সটান পাশ ফিরে বসি, অন্তরে থাকে শুধু আমার গান আর তার উপাস্যা, আর কিছু না। এ কি আমার গান গাওয়া?—এ যে আমার বন্দনা—উপাসনা—স্তব—ধ্যান-ধারণা—যা বলে সব—সব।

সেদিন হরেন্দ্র ব'লে উঠলেন কি,—"মশাই, আপনি যা গান করেন, আপনি ঠিক যেন তাই হ'য়ে যান। আপনি একজন আদর্শ অভিনেতা হ'তে পারেন, দেখছি।" আমি সভয়ে তার পানে চাইছি, এমন সময় শুন্‌লাম, সগুণা মৃদুস্বরে হরেন্দ্রর 'অভিনেতা' শব্দটির শ্রুতিকটুত্বকে সংশোধন ক'রে দিয়ে বল্‌ছেন —"কবি হ'তে পারেন—"

হরেন্দ্র তখন অপ্রস্তুতভাবে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বল্‌লেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই-ই বলতে চাই। আমার ভাষার দৈন্যটা তো বুঝতেই পেরেচেন এত দিনে, নয় কি, মশাই?"

আমি কৃতজ্ঞনেত্রে তাঁর দিকে চাইলাম। পিতৃবন্ধু একটু যেন গর্ব্বের সঙ্গেই সকলের দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। হরেন্দ্রর সঙ্গেও ক্রমে আমার বেশ আলাপ জ'মে আস্‌ছিল। লোকটি বড় সরল আর তত্ত্বসর্ব্বস্ব, একান্ত জ্ঞানপিপাসু। জীবনে জ্ঞানচর্চ্চা ছাড়া বোধ হয় আর কিছু তিনি জানেন না।

লোকটির শিক্ষাদীক্ষা যথেষ্ট, বিদ্বান্ ব'লে, ভাল ছেলে ব'লে তাঁর দেশের সকলের কাছেই নাম আছে, বিদ্বৎ-সভায় বার করবার উপযুক্ত জিনিষ। তবু যেন কি একটা অভাব আমার চোখে প্রথম হ'তেই পড়েছিল। যাঁদের শিক্ষাকে ঠিক পঠিত

বিস্তারই রেখা টেনে মাপ করতে পারা যায়, ঠিক যেন সেই ধাতের মানুষটি। এক কথায় যেন একচক্ষু হরিণ।

যে গান আমি গাহিতাম, তার সুরের বা তাল-লয়ের কোন বাহাদুরীই থাকুক বা না-ই থাকুক, তাদের ভাষার অপরূপ মোহিনীজাল যে হরেন্দ্রর উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল, এমনও আমার মনে হতো না। মনে যার এই অপরূপের আলো পড়েছে, যার নাম রস—সেই বস্তুটির আভাসও স্পর্শ করেছে, সে কি যেখানে যেখানে তার আভাস পড়বে, সেখানে তার নিজের চক্ষু, কর্ণ, মন-প্রাণকে অমন নিস্তরঙ্গ ক'রে রাখতে পারবে?—ভাল বলছে, বাহবা দিচ্ছে—একমনে শুনছে, তবু মনে হ'ত—এর চেয়ে একটা দেহতত্ত্বের বা সাধন-ভজনের গান গাইলেও হরেন্দ্রর কাছ থেকে বোধ হয় এমনি বাহবা পাওয়া যেত।

এমন কি, আমার এমনও মনে হয় যে, সগুণা না হ'য়ে যদি এমনি উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী ও ধনবান্ পিতার একমাত্র দুহিতা অন্য কেউ হরেন্দ্রর জন্য উপস্থিত হ'ত, সে ক্ষেত্রেও হরেন্দ্রর আপত্তির বেশী কিছু থাকত না। সগুণা না হ'লেও যে কোন সুশীলা কন্যারই সে পাণিগ্রহণে আপত্তি করত না।

যাই হোক, তবুও ভাগ্য তাকে অযাচিতভাবে যা দিচ্ছে, তার কাছে আমার মাথা নত ক'রে তো বলতেই হবে হরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ, হরেন্দ্র ভাগ্যবান্! এই যে আমি তাদের কাছে ব'সে দিনের পর দিন ধ'রে গান গেয়ে শুনিয়ে যাচ্ছি, এ যেন এক

রাজারাণীকে তাদের সভার এক দীনগায়কের সঙ্গীতের উপহার নিবেদন! সে রাজা—সে মহারাজা—আর আমি তার সৌভাগ্যের পানে লুব্ধ-দৃষ্টি এক দীনের দীন হীনের হীন কাঙ্গাল কবি।

এমনি সমস্তক্ষণ ধ'রে তিল তিল ক'রে নিজের জীবনোপায় সংগ্রহ করা নিজের দিনপাতের উদ্দেশে (তাই বা ক'দিনের জন্য আর?) এই ভিক্ষুকপণা—এই উঞ্ছবৃত্তি যার, তার জীবনের অস্তিত্ব থাকার চেয়ে না থাকাই কি শ্রেয়ঃ নয়?

কি বল্‌ছি এ আবার? নিজেকে এত ঘৃণ্য, এত লজ্জাস্পদ ব'লে এ ধারণা কেন মনে আস্‌ছে? কিসের এ জীবন আমার—কি-ই বা তার মূল্য?

কোথায় রেখেছি চরণ তাহা তো জানি না,
আছে কি বিষ? হবে, তবু তাহা মানি না।
নাহি কোন বাধা—নাহি কোন গোল,
ঢেউ নাহি জলে শুধু কলরোল,
সেই এক গান, সেই এক তান,
সেই এক নামে বাজে বাঁশি!
ভালবাসি তারে ভালবাসি, শুধু ভালবাসি,
তারে ভালবাসি।
জীবন? মরণ? আছে কি না আছে
কি এর সত্য কে জানে;
একেরি আরতি বাজে শুনি নিতি,
একেরি আসন এখানে।

কাহার বারতা কে শুনিতে চায় বল না-
আশা নিরাশার শুভ্রকৃষ্ণ ছলনা !
নাহি কোন দ্বিধা নাহিক দ্বন্দ্ব,
মানি না মুক্তি মানি না বন্ধ,
হাসি কান্নায় মিলায়ে ছন্দ
এক সুরে বাজে সাধা বাঁশী—

আমার এ 'ভালবাসি' তো শুধু মাত্র এই কবিতা লেখা নয়, —এ যে আমার 'বেদনা', এ যে আমার জীবনেরই অস্তিত্ব—আমার আমিত্ব ! আর তার চেয়েও বড় আমার সাধনা—আমার উপাসনা ! সাধক প্রেমিক কবি যে বলেছেন—

"ফণা ক্যায়সা বকা কয়সি যো উস্‌কো
আস্‌না ঠ্যায়রে !

*　　*　　*　　*

হজরত মহম্মদ ঔর ইয়ুসুফ সে ক্যা নিস্‌বৎ
এ মতলুবে জুলেখা থে উ মতলুবে খোদা ঠ্যায়রে !

যে ভালবাসে, তার বাঁচাই বা কি, মরাই বা কি !—তাকে যে শ্রেষ্ঠ সাধকের সঙ্গেই কবি তুলনা করেছেন, এই কথায়। যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁরও যেমন বাঁচা-মরা সমান, এও যে তেমনি বল্‌ছেন। শুধু কি এই ? আরও এত বড় কথা—শুনতেও প্রাণ কুণ্ঠায় সঙ্কোচে কেঁপে ওঠে, আবার নিঃশব্দে কি ভরসাও পায়। হজরৎ মহম্মদ আর বিখ্যাত প্রেমিক হজরৎ ইয়ুসুফ এঁদের মধ্যে

প্রভেদ কিসের? একজন ভালবাসেন খোদাকে—আর এক জন ভালবাসেন জুলেখাকে—এই বই ত না!—

অভয়দাতা—ভয়ত্রাতা—বীরসাধক যোগী—কবি আমার! তোমাদের পদে শত প্রণাম! তোমাদের মন্ত্র জয়যুক্ত হোক্—আমার প্রাণ স্ফূর্ত্ত হোক—মূর্ত্ত হোক! আর যেন না ভ্রান্তি আসে—বেদনার জড়তা আসে। "যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।" এ মন্ত্র আর যেন না ভুলি।—

এক মাস পরে

শরতের পর হেমন্ত এসেছে! কত দিন পরে আবার আমার এ খাতায় নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। গান শুনিয়ে আর কবে সগুণার পিতার ঈপ্সিত সেই আনন্দের দিন আস্‌বে—যে-দিনে আমি তাঁর দক্ষিণ হাত হ'য়ে তাঁর পুত্রের স্থান অধিকার ক'রে সগুণাকে পাত্রস্থ ক'রে যাব, সেই দিনের অপেক্ষায় পিতৃবন্ধুর সঙ্গে আমারও দিন কাটছে। হরেন্দ্র দিনকতকমাত্র এখানে থেকে নিজের বাসস্থান জব্বলপুরে চ'লে গিয়েছেন। পিতৃবন্ধুর ইচ্ছা ছিল, সগুণার বিয়ে নিজের দেশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দেন, কিন্তু হরেন্দ্র তাতে মোটেই সম্মত হ'ল না। তারা যে দেশে এত দিন ধ'রে বাস ক'রে আস্‌ছে, সেইখানেই তাদের বিয়ে হয়, এই হরেন্দ্রর মত। তার নিজের বাপ-মা কিংবা আত্মীয়-স্বজনও এমন কেউ নেই—যার জন্য জব্বলপুর থেকে দেশে যাওয়ার এই অকারণ ব্যয় সে বহন করবে। এজন্য হরেন্দ্রর সঙ্গে কিছু বাগ্‌বিতণ্ডাও হ'য়ে শেষে পিতৃবন্ধুকে অগত্যাই সম্মত হ'তে হয়েছে।

সে যাক্—আমি কেন আছি এখানে এমন ক'রে? কিসের আশায়? কি দেখতে? এমনি ক'রে গান শোনানো এই-বা আর ক'দিন?

হোক্, তবুও পতঙ্গের জীবনের শেষ স্পন্দন পর্য্যন্ত

আগুনের কাছ ছেড়ে পালাতে পারে কি ? জ্বল্‌ছে—পুড়ছে—তবু পাখা ঝাপ্‌টে আবার সেই আগুনেই পড়ছে ! বৈকালের সঙ্গীত-সভা আমাদের এখনও চল্‌ছে ! এই যে আমার পূজার অবকাশ, এই বা আমার জীবনে আর ক'দিনের জন্য—যে স্বেচ্ছায় একে 'চাই না' ব'লে চ'লে যাব ? তাই পিতৃবন্ধুর অনুরোধ পেতেই সম্মত হ'য়ে গেছি ! তাঁরা এখনও সমান আদরেই আমার গান শোনেন। সগুণা আধুনিক বাঙ্গলা গান গোটাকতক আমারই কাছ থেকে শিখে একেবারে বাজিয়ে গাইতে পেরেছেন, সে জন্য বাপের আর মেয়ের দুজনেরই স্ফূর্ত্তিটা সমানভাবে জেগে উঠেছে। তাঁদের ইচ্ছে, এরই মধ্যে আরও ক'টা গান সগুণা আমার কাছ থেকে আদায় করেন। তারই জোর্ শিক্ষানবিশী চল্‌ছে।

হঠাৎ আজ কাকা (এঁকে এখন আমি কাকাই বলি) প্রাতর্ভ্রমণের পোষাকেই আমার কাছে একেবারে এসে উপস্থিত। এ রকম কখনও আসেন না। মুখটিতেও উত্তেজিত ভাব। আমায় বল্লেন, "নীরেন্দ্র, বেড়াতে যাবে এস।" বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে হঠাৎ এক সময় আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন, "হরেনের অন্যায় দেখেছ ? এ রকম ব্যবহার তার পক্ষে কি অন্যায় নয় ?" আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে চাইলাম। এতক্ষণ তো তিনি একটি কথাও কর্‌নি, তাঁর ভাবান্তর দেখে আমিও বাক্যব্যয় কর্‌তে সাহস পাই নি। তিনিও তখন সেটুকু বুঝে একটু অপ্রস্তুতভাবে বল্‌লেন, "কাল হরেন কি লিখেছে

জান? তার কোন এক খুড়ো তাকে বিলাত যাবার জন্য হাজার কতক টাকা দিচ্ছে, সে বিলাত যাচ্ছে।"

আমি এতে তাঁর রাগের কারণ কি আছে বুঝতে না পেরে বল্‌লাম—"সত্য নাকি?—এ তো খুব ভাল কথা।"

"ভাল কথা? ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাদের বিয়ে, আর সে নভেম্বরের প্রথমেই বেরিয়ে যেতে চায়—এ কি ক'রে সম্ভব হবে?"

আমি ঘোর বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে বল্‌লাম, "তিনি কি বিয়ের আগেই যেতে চান?"

"প্রকারান্তরে তাই কি দাঁড়াচ্ছে না? লিখেছে, আপনি যদি নিতান্ত অমত করেন, তা হ'লে সাত দিনের মধ্যে বিয়ের সব ঠিক ক'রে রাখবেন, আমি বিয়ে ক'রেই অমনি বম্বে চ'লে যাব।"

এমন একটা স্তব্ধতা এসে পড়ছিল যে, কথা কওয়া সাধ্যাতীত হ'য়ে দাঁড়ালো! মোটে আর সাত দিন? জান্‌তাম, এখনো এক মাস! দু'চার মুহূর্ত্তেই কিন্তু সেই বাক্‌রোধ অবস্থাকে সাম্‌লে নিতে চাইলাম। এক মাসের জায়গায় সাত দিন—এই মাত্র তো? যা অবশ্যম্ভাবী, তারই একটু নড়্‌চড়—এই বই তো না? তাতে কি এমন?—ছিঃ—এ কি?—নিজের উপর খুব খানিক চোখ রাঙ্গিয়ে নিয়ে রীতিমত চেষ্টার সঙ্গে বল্‌লাম, "তা হ'লে বড্ড তাড়াতাড়ি পড়লো তো!"

"তাড়াতাড়ি কি বল্‌ছ? এ কি কখনো সম্ভব? দেশ

থেকে আমার সব আত্মীয়দের আনাবো, তাঁরা সব আস্‌বেন ব'লে ঠিক হ'য়ে আছেন। মীরাটে সগুণার যে মামা আছেন—যিনি হরেন্দ্রর সঙ্গে এই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে দেন, ডিসেম্বরে তিনি ছুটি নেবেন—এই বিয়েতে আস্‌বার জন্যে। এটা আমাদের বাঙ্গলার কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, আমাদের কুলগুরু আর পুরোহিত তাঁরা লিখেছেন—এ মাসে আমাদের বিয়ে হয় না। তাঁরা সব অঘ্রাণে ভাল দিন স্থির ক'রে আমার পিস্‌তুতো ভাইকে ব'লে দিয়েছেন। তাঁরা সব এই বিয়েতে আস্‌বেন—বিয়ে দেবেন, আর সাত দিনের মধ্যে বিয়ে? হুকুম করলেই হ'লো?"

গতিক খারাপ দেখে আমি একটু ভয়ের সঙ্গেই বল্‌লাম, "তা হরেন্দ্র কি লিখ্‌ছেন? তাঁর এত কি তাড়াতাড়ি?"

কাকা মাথা নেড়ে বল্লেন, "একেবারে আট্‌ঘাট্ বেঁধেই পত্র দিচ্ছেন তিনি। তাঁর সেই খুড়োর ছেলে দু' তিনবার সিবিল সার্ভিস ফেল ক'রে ফিরে আস্‌ছে—সেই রাগে খুড়ো হাজার কতক টাকা একেবারে হরেন্দ্রকে দেবে বল্‌ছে, যদি সে এখনই বিলাত যায়। ছেলের জন্য যে-সব ব্যবস্থা করা ছিল, সেই সব সুবিধাগুলো হরেন্দ্র এখনি গেলে হরেন্দ্রকে তিনি পাইয়ে দেবেন। হরেন্দ্র লিখেছেন, দেরী কর্‌লে এ সুযোগ হারাব। শুধু তাই না—তার অস্থিরমতি কাকাকেও সে বিশ্বাস করে না। এর পর মন একটু শান্ত হ'লে আর সে দিতে চাইবে না, এই নাকি হরেন্দ্রর ধারণা, তাই সে দিন-

আষ্টেকের মধ্যেই বিয়ে ক'রে যেতে চায়—নয় ত ফিরে এসে বিয়ে করবে লিখ্‌ছে।"

"তবে? আট দিনের মধ্যেই তা হ'লে ঠিক করতে হচ্ছে। তা না হ'লে দু' তিন বছরের—"

"উনি আমার মেয়ে নেবেন ব'লে এত কৃতার্থ করেন নি—যে যা হুকুম করবেন, তাই আমায় মাথা পেতে নিতে হবে। নাই বা গেল বিলাত—কি এমন জরুরী তার? সিবিলিয়ান্‌গুলোকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। ও-সব হবে-টবে না।"

তাঁর জিদ দেখে একটু আশ্চর্য্যই হলাম। ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম, "কিন্তু তিনি তো জমীদারের ছেলে নন্‌ শুনেছি, রোজগার ক'রেই যখন তাঁকে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে, তখন যাতে নিজের উন্নতি হয়—যাতে নিজে গণ্যমান্য হ'তে পারবেন, তাই-ই তো তাঁর করা উচিত।"

"তুমিও এই কথা বল্‌ছ, নীরেন? বিলাত না গেলে গণ্য-মান্য হ'তে পারা যায় না, এখনও কি এ ধারণা দেশের লোকের আছে? তার যদি ঐ লাইনেই যেতে ইচ্ছে, দু' তিন পুরুষ ধ'রে তারা মধ্যদেশবাসী, এম-এ, ল পাশ করেছে, তাদের জব্বলপুর কোর্টে উকীলের খাতায় নামও পড়েছে, চেষ্টা করলে দেওয়ানী, ফৌজদারী যেদিকে তার মতি, সেই দিকেই আর একটা একজামিন দিয়ে নিয়ে ক্রমে উঁচুপদ পেতে পারবে! দেশী লোকরাও কি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কমিশনার এ-সব হচ্ছে না? কিছু না, কিছু না, ও একটা হুজুগ মাত্র।

বিলেত যাবার একটা সুবিধা পেয়েছে—বাস্, আর কি, দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়েই ছুট্‌তে হবে। বারণ ক'রে দিলাম, ও-সব হবে-টবে না।"

আমি মৃদুস্বরে আবার একবার বল্লাম, "কিন্তু সে উন্নতি অনেক সময়সাপেক্ষ, আর এ—"

"বাপু, আমার তো ঐ এক মেয়ে, এত দিনে তার বিয়ে দিতে যাচ্ছি, কোথায় দুটিকে নিয়ে মনের আনন্দে এখন কিছুদিন কাটাবো, তা না, এই সময়েই তার ইংলণ্ড-ফ্রান্স ছুট্‌বার ঝোঁক? কিছুতেই এ হবে না, তাকে আমি লিখে দিয়েছি। আমি ও লাইনটাকে পছন্দই করি না—আমার মেয়ের জন্যে যদি সে এতটুকু ইচ্ছাও দমন কর্‌তে না পারে—"

বলিতে বলিতে রাগটাকে কোনমতে চাপিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কাকা বলিলেন, "আমার যাতে একেবারে অনিচ্ছা, তা নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে আর তর্ক কোরো না। আমার সগুণা এ বিষয়ে আমায় খুব চেনে। আমার মতের ওপর কখনও সে একটা উচ্চবাচ্য পর্য্যন্ত করে না। এ বিষয়েও সে কিছু বল্‌বে না, দেখো।"

এইবার আমিও চুপ ক'রে গেলাম! বাবা রে, এ কি জেদী লোক? উচিত-অনুচিতের একটা তর্ক পর্য্যন্ত যিনি সইতে পারেন না, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াও তো মহা দায়। মনে মনে একটু অবাক্ হ'য়েই থাক্‌লাম।

পরদিন

কাল বিকেলেও যথানিয়মে একবার ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু বড় অসাচ্ছন্দ্য লাগ্‌ছিল। কি জানি, ওঁদের মনে এখন কি রকম উৎকণ্ঠা বা অস্বস্তি চল্‌ছে, এ সময়ে পরের উপস্থিতি কেমন লাগ্‌বে তাঁদের। কিন্তু না গেলেও কাকা মশায় পাছে মনে ক'রে বসেন, তাঁর ঐ রকম মতের জন্য আমিও বুঝি মনে মনে বিরুদ্ধ তর্ক চালাচ্ছি। পছন্দ কর্‌তে পার্‌ছি না ব্যাপারটাকে, তাই সেখানে যাচ্ছি না। কথাটায় একটু সত্যও আছে। যিনি নিজের মেয়েকে এতখানি শিক্ষিতা ক'রে তবে বিয়ে দিচ্ছেন, তিনি জামাইয়ের বিলাত যাবার নামে এত খাপ্পা হয়ে উঠবেন, এটা একটু অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার বলেই আমার মনে যে না লাগ্‌ছিল, তা নয়! তবে তাঁর কন্যা যদি এতে আপত্তি না করেন, চাই কি হরেন্দ্রও হয় ত শেষে নিজের দার্ঢ্য ত্যাগ কর্‌বেন! আমি কেন মাঝ হ'তে তাঁর বিরক্তি সঞ্চিত করাই! আর এটুকুও বুঝলাম যে, সত্য তিনি মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘরকন্না কর্‌বার জন্যও বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ধুমধাম ক'রে বহুদিনের দূরপরিত্যক্ত আত্মীয়স্বজনকে কাছে এনে মেয়েটির বিয়ে দেবেন, তার মধ্যেও জামাইয়ের এই বাদ সাধা! তার পরে বিবাহ হ'বামাত্রই দুই-তিন বৎসরের মত তাঁদের সঙ্গে জামাইয়ের এই বিচ্ছেদ—এ বেচারার মোটেই ভাল লাগ্‌বার কথাও নয়।

উনি সাহঙ্কারে যা বলেছিলেন, সেটাও দেখছি কতকটা সত্যই বটে! সগুণার মুখে পর্য্যন্ত এতটুকু ভাবান্তর বুঝতে পার্‌লাম না,—কাজে তো নয়ই। বাপের মতের সঙ্গে তা হ'লে মেয়েরও বোধ হয় ঐ-ই মত। তা হ'লে হরেন্দ্রও মত ফেরাতে নিশ্চয়ই বাধ্য হবেন; গোল্ তো চুকেই গেল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লাম। সাতদিনের মধ্যেই নয়, এখনো যে একমাস সময় আছে; এতে একটা সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপারই যেন কানের কাছ দিয়ে চ'লে গেছে, এই ধরণে মনের এই নিশ্বাস ফেলায় অন্তরে অন্তরে আমি নিজের কাছে একটু লজ্জিতও হচ্ছিলাম, আবার তার দীনতা দেখে অনুপায়ের একটু হাসিও মনে যে না আস্‌ছিল, তা নয়। হায় রে ভিখারী, এ একমাস আর সাত দিনে তোর কতটাই বা লাভ-লোকসান? এ উঞ্ছবৃত্তিতে তোর কতটাই বা লাভ? তোর না এ পূজা, এ না আশাহীন উদ্দেশ্যহীন ভালবাসার সাধনা মাত্র? তবে এতটুকুতেও লোভ কেন? এই তো দিনকতক পরে শুধু এই সুমুখে ব'সে গান গাইবার স্মৃতিমাত্র সম্বল ক'রে আর এই গানগুলিকে মাত্র সম্বল নিয়ে জীবন-সমুদ্রে চিরকালের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে! সেই সমুদ্রের তীরে ব'সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত আগে পাছে মনের কিসেরই এত স্বস্তি বা অস্বস্তি?

ভুল,—সব ভুল! মানুষ মানুষই! যতক্ষণ এই তার রক্তমাংসের উপাদান এই চোখ কান নাকের সাফল্য সে পাবে, ততক্ষণ তার সাধ্য কি যে, সে লোভকে ত্যাগ করে! অতীন্দ্রিয়

গুহায় সে কখন্ ঢুকে বস্‌বে—যখন সে বাইরে আর কিছু পাবে না—মনে ভিন্ন যখন আর বাইরে তার বিন্দুমাত্রও কিছু থাকবে না—তখনই। তার আগে নয়।

৪ঠা নভেম্বর ২০শে কার্ত্তিক। ওঁদের বাড়ীতে একখানা পাঁজি দেখলাম, মেয়ের বিয়ের জন্যই বোধ হচ্ছে সগুণার বাবা এই বাঙ্গালা পাঁজিখানা আনিয়াছেন। তারিখটা চোখে পড়লো তো লিখেও ফেল্‌ছি—আজ আমার এই অপূর্ব্ব ডায়েরীতে। যাতে 'কালে'র সঙ্গে স্থানের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। যাতে আছে কেবল একটি মাত্র জিনিষ! যার নাম 'পাত্র' আর তারই শত আক্ষেপ-বিক্ষেপের তালিকা মাত্র।

হরেন্দ্র এসেছেন। ঘণ্টা কতক মাত্র এসেছেন, তাই বাইরের লোক আমি, এখনই সেখানে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, কিন্তু কাকার আহ্বান এসে আমায় ঘরে 'তিষ্ঠুতে' দিল কই? নিজের মনও অবশ্য যথেষ্টই ঔৎসুক্য বোধ করছিল! এ আহ্বানকে অবহেলা করতে তো সে পারলে না!

বাংলোটার এক পাশ দিয়ে গিয়ে তবে কাকার ঘরে পৌছুতে হয়। যথানিয়মে সেইখান দিয়ে যেতে খোলা জানালার পথে হঠাৎ একখানি অপরিচিত মুখ দেখে মনে মনে একটু প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু হয়ে পড়লাম। কে ইনি? এঁদের কি আত্মীয় কেউ হরেন্দ্রর সঙ্গে এসেচেন? মুখখানি রমণীর—বিধবা রমণীর। তাঁর কাছে সগুণাও দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি একখানি হাত সগুণার কাঁধের উপর রেখে আর একখানিতে বোধ হয় তাঁর একটা

হাত ধ'রে মুখের পানে চেয়ে কি যেন বল্‌ছিলেন, আর সগুণা মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলেন। এই দৃশ্যে চোখ পড়বা-মাত্র আমি অবশ্য চোখ নামিয়ে নিজের গন্তব্য-পথে চল্‌লাম, কিন্তু সেই অপরিচিতা রমণীর শান্ত পবিত্র মুখখানি তখনই যেন মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল! মন বার বার প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল—কে ইনি! কাকার ঘরে গিয়ে গৃহের এক দিকে উপবিষ্ট হরেন্দ্রর মুখের দিকে নজর পড়তেই মন ব'লে উঠলো—"চিনেছি।" এই ধরণেরই সুগঠন মুখের ডোল—পরিষ্কার রং—আয়ত-সুন্দর চক্ষু,—নিশ্চয়ই ইনি হরেন্দ্ররই কেউ হবেন। পিসী মাসী হবার মত তাঁর বয়স তো বোধ হ'ল না। আমাদের সমবয়সী বলেই যেন বোধ হয়, হয় ত দুই এক বৎসরের বড়ও হ'তে পারেন! তবে কি হরেন্দ্রর দিদি বা বোন্ ইনি। এঁকেও নিয়ে যখন হরেন্দ্র এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই সগুণার পিতার মতেই সম্মত হয়েছেন! ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে সাগ্রহে ব'লে বস্‌লাম, "এই যে এসেছেন। যাক্—বিলাতী ভূত ঘাড় থেকে নেমেছে তো?" প্রশ্নের কোন উত্তর তো পেলামই না, উপরন্তু যাঁর দিকে এতখানি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলাম—তিনি একটু বিমর্ষভাবে একবার চেয়ে তখনই দৃষ্টি পর্য্যন্ত নামিয়ে নিলেন। আমি অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে গেছি দেখে কাকা ঘরের আর এক কোণ থেকে আমাকে ডাক্‌লেন, "এ দিকে এস, নীরেন।"

কুণ্ঠিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লাম। তিনি রাগে যেন

টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছেন! গোঁ-গোঁ ক'রে আমায় যা বল্লেন, তার এই অর্থোদ্ধার কর্‌লাম—হরেন্দ্র তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। সে এই আটদিনের মধ্যেই বিবাহ সেরে বিলাত যেতে চায়, নয় ত বছর দুই পরে ফিরে এসে বিয়ে কর্‌বে বল্‌ছে। কিন্তু তিনিও তা কিছুতেই দেবেন না। যদি হরেন্দ্র তাঁর মেয়ে চায়, এই বিলাত যাওয়ার হুজুগ তাকে ত্যাগ করতেই হবে, নইলে সে যা ইচ্ছা করুক, তার সঙ্গে আর তাঁদের কোনই সম্পর্ক থাকবে না।

সম্মুখে হরেন্দ্র ব'সে, আর তারই সাম্‌নে একটা পর বাইরের লোককে কাকার এই কথাগুলা বলা হরেন্দ্রর পক্ষে যে কতখানি পীড়াদায়ক, তা মনে ক'রে আমার লজ্জায় মাথা তুল্‌তে ইচ্ছে করছিল না। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আমি "আমায় কেন এ সব বল্‌ছেন" ব'লে উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড ধমকের সঙ্গে "শোন আগে সব কথা" শুনে ব'সে পড়তেও বাধ্য হয়েছি। লোকটি জগতের সকলের উপরেই জোর চালাতে চান। আমিও যেন তাঁর সগুণা, হরেন্দ্র বা তাদেরই মত পুত্রস্থানীয় কেউ একজন, যারা তাঁর আদেশ মান্‌তে বাধ্য। কিন্তু মনে মনে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেও তাঁর জোরকে অস্বীকার কর্‌তেও তো পার্‌লাম না, ব'সে সব কথাগুলি শুন্‌তেও তো হ'ল।

তাঁর বক্তব্যগুলি শেষ ক'রে যখন তিনি থাম্‌লেন—আমি তখন আবারও যখন বল্‌লাম, "আমার মতামতে আপনাদের কি হবে! আপনারা কি কেউ নিজের মত ত্যাগ ক'রে আমার

পরামর্শ নেবেন যে, তাই আমায়ও এর মধ্যে জড়াচ্ছেন ?" তখন তিনি একটু অপ্রস্তুত ভাবে "না,—আমার যা মত আর শেষ কথা, তাই-ই তোমায় শোনাতে ডেকেছি। তোমরা ইয়ংম্যান্, শেষে না আমায় দোষ দাও! সগুণার উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবে না। আচ্ছা, তুমি এখন না বস্‌তে চাও, যেতে পার"—ব'লে আমায় ত মুক্তি দিলেন। আমিও বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে তখনই নিজের বাসার দিকে রওনা হব ভাব্‌ছি, এমন সময়ে দেখি, হরেন্দ্রও ঘর থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। লোকটির বিপন্ন অবস্থা বুঝে মনটার মধ্যে ভারি অস্বস্তি ধরেছিল। এ কি জুলুম, আর তার জন্য এইরকমে লোকটিকে নাজেহাল করা! পূর্ণ সহানুভূতিতে তার পানে চেয়ে কিছু বল্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় তিনিই আমার পানে অত্যন্ত বিব্রতভাবে চেয়ে বিষণ্ণ-স্বরে বল্‌লেন, "কি করা যায় বলুন তো।" এবার আর পরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত বোধ কর্‌লাম না; উত্তেজিতভাবেই ব'লে উঠলাম, "শোনেন কেন ওঁর কথা; সগুণাকে জানিয়ে তাঁর এ বিষয়ে কি পরামর্শ, কি তাঁর মত, জেনে সেই রকম কাজ করুন।"

হরেন্দ্র কিন্তু একটুও উত্তেজিত না হ'য়ে মৃদুস্বরে বল্‌লেন, "যাই হোক, এ আটদিনের মধ্যে ওঁর এতখানি অমতে বিয়ে তো একেবারে অসম্ভবই বুঝ্‌ছি! সগুণাকেও আমি তাঁর বাপের অমতে এখনই কোন অন্যায় অনুরোধও কর্‌তে পার্‌ব না। মুস্কিল এই হচ্ছে যে, দিদিকে কোথায় রেখে যাই? ওঁর

এই সব কথাবার্ত্তার পরে দিদিকে আর তো এঁদের কাছে রাখ্‌তে অনুরোধ কর্‌তে পার্‌ছি না!"

তা হ'লে হরেন্দ্র বিলাত যাবার জেদ্ বজায়ই রেখেছেন! কিন্তু ঐ আর একটি জেদী লোক তাঁর জেদ্ বজায় না থাকলে তিনি যে কি মূর্ত্তি ধর্‌বেন, কি না কর্‌তে চাইবেন, তা এখনও হরেন্দ্র ধারণায় আনতে পার্‌ছেন না। কিন্তু আমি যে এই গত দু'মাসেই তাঁর চরিত্র অনেকটা আয়ত্ত কর্‌তে পেরেছি। এর ফল যে ভাল হবে না—হরেন্দ্র যে ভাব্‌ছেন, কালে উনি শান্ত-মূর্ত্তি ধরবেন, এ আন্দাজ যে তাঁর মিথ্যাও হ'তে পারে, এইটা আমি তাঁকে বোঝাতে গেলাম। তিনি সমান নিরুত্তেজিত-ভাবে উত্তর দিলেন, "এ আমার সম্ভব ব'লে মনে হয় না। কালে ওঁর এ রাগ প'ড়ে যাবে। এঁরা শিক্ষিত লোক—সগুণাও বাঙ্গালার দশ বছরের মেয়ে নয়। দুটো বছরের জন্য আর এই রকম কারণে কি কোন রকম অন্যায় এঁরা কর্‌তে পার্‌বেন? ওঁর এ একটা সাময়িক জেদ্‌মাত্র। বিলাত যাওয়াটা পছন্দ করেন না, তাই এ রাগারাগি। পরে ঠাণ্ডা হবেন। আমি বেশী বিব্রত হচ্ছি আমার দিদির কি ব্যবস্থা কর্‌ব ভেবে! আমার দ্বিতীয় অভিভাবক আর কেউ তো নেই, জব্বলপুরের বাস উঠিয়ে দিয়েই এসেছি। ভেবেছিলাম, দিদিকে এঁদের কাছেই রেখে যাব—কিন্তু এই রাগারাগিতে সেই সুবিধাটি নষ্ট হ'ল।"

আমি নিজের উত্তেজিত ভাবে তাঁর কাছে একটু লজ্জিতই হয়ে পড়লাম। হরেন্দ্র যা বুঝেছেন, এই হয় ত ঠিক,—আমি

বুঝি একটা গোঁয়াতুর্মিরই পরামর্শ দিতে যাচ্ছিলাম। সগুণাকে যেন আমিই হারিয়ে ফেল্‌ছি, এমনই একটা উত্তেজনা মনে জেগে উঠছিল। একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লাম, "আপনার দিদি, তাঁকেও বুঝি এনেছেন? কেন, আপনার কাকা যিনি বিলাত যেতে টাকা দিচ্ছেন, তাঁর সংসারে—"

"সে হবার যো নেই, তিনি সে রকম লোক নন। টাকাটা দিচ্ছেন একটা ঝোঁকের মাথায় বৈ তো না। দিদিকে দেশের বাড়ীতে ব্যবস্থা ক'রে রেখে আস্‌তে গেলে মেল্‌টা তো আর ধর্‌তে পার্‌ব না। তা হ'লে সবই মিথ্যে হ'য়ে যায়।"

"যদি পৌঁছুবার মাত্র দরকার হয়, আর আপনার সত্যই তাতে কিছু উপকার হয়, তা হ'লে যে সে ই তো এ কাজটা পার্‌বে। আমাকেই যদি বলেন—"

হরেন্দ্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে ফেলে ব্যগ্র কণ্ঠস্বরে বল্‌লেন, "পার্‌বে, ভাই, তুমি? সত্য বল্‌ছ? আঃ, তা হ'লে তো ভাবনাই থাকে না।"

"কিন্তু আপনি ব্যবস্থা করার কথা কি বল্‌ছিলেন, সে কি আমার দ্বারা হবে?"

"তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না ভাই, আমার দিদি নিজেই সে সব ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বেন। মাত্র দেশে পৌঁছুনো। এতটা উপকার যদি কর—"

আজ হরেন্দ্র আমায় নিকট-বন্ধুর আসন দিলেন দেখ্‌ছি। আমিও বল্‌লাম, "তোমার যিনি দিদি, তিনি আমারও দিদি।

আমিও তো দেশে যাবো এইবার। তখন ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।" হরেন্দ্র একটু চিন্তিতভাবে বল্‌লে, "কিন্তু ভাই, ততদিন ওঁকে কোথায় রাখব? আমার যে আজই একবার যাওয়ার সব বন্দোবস্ত কর্‌তে বম্বে যেতে হবে—সেই কাকার কাছে। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর বিষয়কর্ম্মে বম্বে এসে হোটেলে থাকেন। দিদিকে এঁর এই ভাবের পর এখানে রেখেই কি যাব? অবশ্য আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি—" তার মুখের কথা আর শেষ হ'লো না। পাশের একটা দোর খুলে সেই দিদি বের হয়ে এসে একেবারে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লেন, "হরেন যে ক'দিন ফিরে না আসবে, আর তোমার দেশে না যাওয়া হবে—সে ক'দিন তোমার বাসাতেই আমি থাক্‌তে পারব।"

আমি ত্রস্তে তাঁহাকে প্রণাম ক'রে কুণ্ঠিতস্বরে বল্‌লাম, "কিন্তু, দিদি, আমার বাসায় যে চাকর বামুন ছাড়া আর কেউ নেই, আপনার যে অসুবিধা হবে!"

"কিছু না, একটা ঝি এনে দিও তা হ'লেই হবে। হরেনের বন্ধু তুমি, তোমার বাসায় অসুবিধা কেন হবে? আমি এখনই তোমার বাড়ী যাব, একটা গাড়ী ডাক তোমরা।"

বুঝলাম, এঁদের ব্যবহারে হরেন্দ্রর যেটুকু রাগ না জন্মেছে, এঁর তার চেয়ে অনেকটা বেশী রাগই হয়েছে। তাই এঁদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে একান্ত পর যে আমি, আমার বাসাতেও তিনি এখনই যেতে ইচ্ছে করেন।

তাঁর ইঙ্গিতে হরেন্দ্র একটা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে এসে তাঁকে তুলে নিয়ে আমার বাসার দিকে রওনা হ'ল, আর আমিও একটু কর্ত্তব্যমূঢ়ভাবে তাদের অনুসরণ কর্‌লাম। পিতৃবন্ধু হয় ত আমার উপর অসন্তুষ্টই হবেন, কিন্তু আমি আমার মনুষ্যত্বকে তো বিসর্জ্জন দিতে পারি না। এ ক্ষেত্রে এই বিপন্নদের আশ্রয় মানুষমাত্রেই দিতে বাধ্য। তবে হরেন্দ্র যে একটু কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, এ বল্‌তেই হবে। ওঁর অসম্মতি জেনেও কি ব'লে সে এত কৃতনিশ্চিত হ'য়ে বোন্‌কে পর্য্যন্ত সঙ্গে ক'রে এনে উপস্থিত হয়েছে? বাপের দৃঢ়তার জন্য সগুণাও বোধ হয় লজ্জিত বা দুঃখিত হ'য়েই হরেন্দ্রর দিদির এই চ'লে আসায় একবার বাধাও দিলেন না।

৮ই নবেম্বর। হ্যাঁ, ইনি দিদিই বটেন, এঁর জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হয় না। সব ব্যবস্থা ইনি নিজেই ক'রে নিতে পারেন, হরেন্দ্র ঠিকই বলেছিল।

নিজের ব্যবস্থা তো ক'রে নিয়েইছেন, আমার এই ক্ষুদ্র সংসারেও 'দিদি' হ'য়ে ব'সে আছেন। এই ছন্নছাড়া ঘরকন্না— এরই মধ্যে এমন গুছিয়ে গাছিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে চারদিকের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, এ ঘরকন্নার পাট যে আমার শীগ্‌গিরই তুল্‌তে হবে, তা মনে ক'রে দুঃখ হচ্ছিল। দিদি কিন্তু সে কথা শুনে বলে বস্‌লেন, "অকারণে যে ঘর গ'ড়ে ওঠে সে ঘর ত সহজে ভাঙ্গে না, ভাই।"

সত্যই কি আমি এবার এখানকার দোকানপাট তুলে

ফেলতে পার্‌ব? দিদিকে রাখ্‌তে তাঁদের দেশে ও সেই সঙ্গে নিজের দেশেও একবার যেতে হবে বটে, কিন্তু—না, এর বেশী আজ আর কিছু ভাব্‌তে পার্‌ছি না।

হরেন্দ্র সেই দিনই বম্বে চ'লে গেছে। মাঝের এই তিন দিনের মধ্যে একবারমাত্র আমি কাকার কাছে গিয়েছিলাম।—তিনি আমার কাছেই খবর পেলেন যে, হরেন্দ্র তার কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার দিদিকে আমার কাছে রেখে বম্বে চ'লে গিয়েছে। তিনি কোন প্রশ্ন না ক'রে গম্ভীরভাবে কেবল আমার দিকে চেয়েছিলেন। কেন জানি না। অসুস্থ হয়ে থাকেন, নাচার। কিন্তু আমার এই একটু আশ্চর্য্য লাগ্‌ল যে, সগুণা এসে একবার হরেন্দ্রর দিদির খোঁজও করলেন না। তিনি তো তাঁদের অতিথি, এমনভাবে তিনি চ'লে গেছেন, এর জন্যও বাপ বা মেয়ে কেউ যে একটু খোঁজও নিলেন না, এ ব্যাপারটা আমার একটু বিসদৃশই লাগ্‌ছিল। খুব সম্ভব, সগুণার এখন মনের মধ্যে একটা সংক্ষোভ চলছে, বাইরের লোকের সম্মুখে বেরুবার বা কথা কইবার তাঁর সময় নয়; কিন্তু দিদির কি ব্যবস্থা হ'ল, এটুকু জিজ্ঞাসা করতেও কি তাঁর একবার আমার সামনে আসা উচিত ছিল না? বাপের অমতে কি এটুকুও করা যায় না? তাঁর বাপ কি মেয়ের এই মনুষ্যত্বটুকুরও বিরোধী হবেন?

ঘরে ব'সে এই কথাগুলোই ভাব্‌ছিলাম বুঝি। ডাক এলো। হরেন্দ্রর চিঠি। তার কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার

উত্তেজনায় ও সঙ্গীর সুবিধা হওয়ায় হরেন্দ্র এই মেলেই ইংলণ্ড রওনা হ'ল। আমার কাছে পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে যাতে তার দিদিকে সুবিধামত দেশে পৌঁছে দি, তার জন্য সানুনয় অনুরোধ ও বহুবিধ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে সে পত্র শেষ করেছে। দিদিকেও প্রয়োজনীয়বিষয়ক কথায় পূর্ণ একখানা পত্র এই সঙ্গে দিয়েছে। আমার উপরে তিনি যেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার নির্ভরতার সঙ্গেই এ কয়দিন আমার কাছে অপেক্ষা করেন, ইত্যাদি কথাও সে পত্রখানার শেষে আছে।

'দিদি' আমার জল খাবার হাতে ক'রে এনে দাঁড়াতেই "আমায় ডাকলেন না কেন, দিদি" ব'লে কুণ্ঠিত হ'য়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে আমার হাতের পানে চেয়ে বল্লেন, "হরেনের চিঠি কি?"

"হ্যাঁ—এই দেখুন।" ব'লে চিঠিগুলো তাঁর হাতে দিয়ে খাবারের রেকাবটা টেনে নিতে তিনি "তুমি খাও ততক্ষণ" ব'লে, চিঠি পড়তে মন দিলেন।

আমি তাঁর সযত্ন-প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদকে মনে মনে তারিপ করছি এমন সময়ে দিদি তাঁর পত্রপাঠ শেষ ক'রে একটু স্তব্ধভাবে থেকে শেষে আমার দিকে চেয়ে বিষণ্ণ-স্বরে বল্লেন, "তার পরে? দিদিটি যে এখন একেবারেই ঘাড়ে পড়ল, ভাই? একে কাঁধ থেকে কবে ফেলতে পারবে?"

আমি তাঁর ব্যথিত ভাবটা বুঝতে পেরে কুণ্ঠিত হ'য়ে উত্তর দিলাম—"এমন কথা কেন ভাবছেন দিদি? আপনি যদি বলেন,

আজই চলুন আপনাকে নিয়ে দেশে রওনা হচ্ছি। আমার দিদি নেই, হরেন্দ্র এই দুদিন যে আমাকে তাঁর দিদিটি দান করেছেন, এতে আমার কি লাভ ছাড়া লোকসান হয়েছে ভাবছেন, দিদি ?"

'দিদি' সেই একই ভাবে বললেন, "লাভ-লোকসানের কথা থাক্, তবে তুমি যে আমার জন্মান্তরের ভাই, এই দু'দিনেই তো বেশ বুঝতে পারছি। আমার জন্য তোমার কোন ক্ষতি কোরো না,—যে দিন তোমার সুবিধা হবে—"

আমি সহাস্যে উত্তর দিলাম, "আমার ক্ষতিবৃদ্ধির কিছুই যে নেই, দিদি। ঘরে ব'সে থাকা আর পথে বেরুনো দুইয়েই আমার সুবিধা অসুবিধা সমান। তবে জন্মে কখনো দিদি পাইনি, এখানে এসে এ দুদিনে হঠাৎ তাই পেয়ে এই দুদিনের ঘরেও যে একটু মন ব'সে গেছে, যে ক'টা দিন এখন পথে না বেরুতে হয়, সেইটুকুই যে লাভ, এটুকুও স্বীকার করছি।" 'দিদি'র নিজের ভাবনায় ঈষৎ ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি আমার এই কথায় যেন ঈষৎ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল, আর তাঁর চোখের কোণ দুটো কেমন যেন চক্‌চকে হ'য়ে উঠল। মা যেমন কোন ছেলের মা নেই শুনে মমতা-বিদ্ধ অন্তরে হঠাৎ "আহা" ব'লে ওঠেন, এই 'দিদিটি'ও বোধ হয় এই তাঁর দুদিনের ভাইটি 'দিদি নেই' শুনে তেমনই করুণায় আর্দ্র হ'য়ে উঠলেন। তখনই বলেও ফেল্‌লেন, "দিদি না থাক, মা তো আছেন ?"

"তা আছেন বটে, কিন্তু তাঁর এ ছেলেটি মাথাপাগলা

দেখে তার প্রত্যাশা তিনি অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছেন। যাকে এখনই আপনার জন্মান্তরের ভাই ব'লে স্বীকার করলেন, সেটি যে আপনার পাগল ভাই, তা বোধ হয় এতদিনে বুঝতেও পেরেছেন, দিদি ?"

'দিদি' একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "তা পেরেছি সেই দিনই। এ ক'দিন এ জন্মের ভাইটির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন ব্যস্তবাগীশ স্বভাবের জন্য যা অস্বাচ্ছন্দ্য লাগছিলো, আজকে তার শেষ সীমায় ভাইটি পৌঁছে দিয়ে গেলেন ব'লেই বোধ হয়, আজ তার কাণ্ডকে আর অসঙ্গত লাগছে না। এই আমাদের পাগল ভাইটিকে পাবার জন্যই যেন এ সব অসম্ভব কাণ্ড ঘটার দরকার ছিল। মাথাস্থির ভাইটি তো আমার এমনই কাণ্ড ক'রে তুললেন, যাতে সগুণাদের ওপরেও আমার আর ক্ষোভ রাখা চলছে না। তার এ স্বভাবের ওপর সে ভদ্রলোকের নির্ভর না হবারই তো কথা। সগুণা মেয়েটিও তার স্বভাব বোধ হয় ভাল ক'রেই জেনেছেন,—আচ্ছা, এঁদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক, নীরেন ?"

"কিছুই না, দিদি, উনি আমার বাপের বন্ধু ছিলেন, তাই কাকা বলি।"

"তবে এখানে তুমি কত দিন থেকে আছ ?"

"মাস তিনেক হ'তে চললো, দিদি। আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ছিল না, বেড়াতে বেড়াতে এসে প'ড়ে পরিচয় ক্রমে ফুটে উঠলো। তার পর—এইবার চ'লে যাব—"

"আমায় রাখতে যেতে হবে বলেই কি এ যাওয়া তোমার ;"

"না, দিদি,—এইবার—যেতেই হ'ত—"

"তোমার যাওয়া না যাওয়ায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই যখন, তখন আমায় পৌঁছে দিয়েও তো চ'লে আস্তে পারবে। এখান্‌টি যখন তোমার ভাল লেগেছিল, তখন আবার না হয় ফিরে এস। আমার যাওয়ার সূত্রই তোমায় স্থানভ্রষ্ট না করে যেন, দাদা।"

তাঁর এই ভদ্রতা ও স্নেহব্যগ্র চিন্তামাখা কথাটার ঠিক্ উত্তর বোধ হয় দিতে পারিনি! অন্যমনস্কভাবে কেবল "না" টুকু মাত্র বলেছিলাম, তাই তিনি যেন একটু বিস্মিত, একটু অনুসন্ধিৎসুভাবে, আমি আরও একটু কিছু তাঁকে বলি, এই রকম ইচ্ছা ও প্রতীক্ষা নিয়েই, বোধ হয়, আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। কিন্তু আর আমি একটা কথাও কইতে পারলাম না। যেতে হবে, মনের এই ভাবনার আন্দোলনে তখন অন্য কথা কওয়া আমার পক্ষে অসম্ভবই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে উঠে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, আর 'দিদি' সেইভাবে ঘরের ভিতরেই বোধ হয় তখন দাঁড়িয়ে রইলেন।

সম্মুখেই দেখি, কাকার বেয়ারা একখানা চিঠি নিয়ে [illegible]ছে। এই দু'দিন যাইনি দেখে বোধ হয় ডেকে পাঠিয়েছে কেন আর এ মিছে আত্মীয়তা! আর একে বাড়িয়ে কাজ কি? যেতে তো হবেই,—তবে আর কেন?

চিঠিখানা ভারী, এত কি লিখেছেন। রাগ করেছেন, হয়

ত, তাই ওকে পাঠিয়েছেন বুঝি। এই কথা ভাবতে ভাবতেই চিঠিখানা খুলতে লাগলাম।—রাগ নয়—সম্পূর্ণ উল্টো কথা!—দু'খানা চিঠি, একখানা হরেনের চিঠি—তাঁকে লিখেছে। অন্য খানায় কাকা আমায় লিখছেন—

নীরেন্—কেন তুমি এ দু'দিন এলে না? আমারও মন বড় উৎক্ষিপ্ত ছিল, নইলে এতদিন তোমায় ধ'রে নিয়ে আস্তাম! আজ সুস্থির হয়েছি। এই কতক্ষণ হরেন্দ্রর চিঠি পেলাম, এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি, দেখো। তাঁর সঙ্গে আমি যে প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ হয়েছিলাম, তা থেকে নিজেকে মুক্ত বোধ করছি। যদিও তিনি তাঁর অসঙ্গত স্পর্দ্ধা আর আশার শেষ পর্য্যন্ত জের্ টেনে গেছেন, বিলাত থেকে ফিরে তিনি আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রে আমায় কৃতার্থ কর্বেন, এবং আশা রাখছেন, তখন আমি আমার এ রাগ ভুলে যাব! কিন্তু তাঁর এত কৃতার্থ আমায় কর্বার কোনই দরকার দেখছি না। আমাদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্কই নেই। এ কথা আমি অনেকবারই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি। সগুণাও আমারই মেয়ে! হরেন্দ্র তার "সুসংযত পবিত্র-সুন্দর স্বভাবের" ওপর যতই আস্থা স্থাপন করুন না কেন, তাঁর এ সব স্তুতিবাদ এখন অসহনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করছে মাত্র। তার প্রসঙ্গ আমাদের মধ্যে আর নয়।

তোমার কি তোমার নিজের লেখা সেই চিঠিখানার কথা মনে আছে? যাতে তুমি সগুণাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলে? আর সে কথাটাও কি তোমার মনে আছে যে,

তোমার বাবা আমার সঙ্গে এ কথাটা বহুদিন আগে স্থির ক'রে রেখে স্বর্গে যান? মাঝে তোমার আত্মীয়-স্বজনের ঔদাসীন্যে আমি দুঃখিত হ'য়ে সগুণার জন্য অন্য পাত্র খুঁজি, আর সেই সময়েই এই মাকালফলটি আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। তোমার প্রার্থনায় যে আমি পরে আর কান দিইনি, সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হরেন্দ্রর এই কাণ্ডে শেষ হ'ল। এখন বুঝছি, সগুণা তোমারই জন্য বিধিনির্দ্দিষ্টা হ'য়ে আছে। তুমি আজই আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।—আশীর্ব্বাদ জেনো। হরেন্দ্রর 'দিদি'র কি ব্যবস্থা সে ক'রে গেছে! তাঁকে পৌঁছুতে তোমায়ই কি দেশে যেতে হবে? প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরও তোমার এই সহৃদয়তা দেখে বড় সুখী হয়েছি।—প্রতীক্ষায় থাক্‌লাম—এখনি একবার আস্‌তে পার্‌বে কি?

ইতি—তোমার কাকা।

জানি না, লোকটাকে কি ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলাম। কি করেছিলাম—কি ভেবেছিলাম, তখন কিছু জানি না! কতক্ষণ পরে যে 'দিদি'র ডাকে সজাগ হ'য়ে তাঁর নির্দ্দেশমত স্নানাহারের জন্য উঠলাম, তা এখন কিছুতেই মনে করতে পার্‌ছি না।

১ই নবেম্বর। আবার সেই সম্পূর্ণ বিষম বস্তুর অনুভব "বিষামৃতে একত্র করিয়া।" এ অমৃত অবশ্য অন্তরের অনুভ[illegible] নয়, কিন্তু আজকের এই বিষ—স্বপ্নেও যার আর আশা কারনি, সেই কল্পনারও অস্পৃশ্য বস্তুকে ফিরে পাবার আনন্দকে ফেনিল

ক'রে তুলেছে. একে তো কোনদিন অনুভব করিনি! সগুণাকে আমি পাব বা পেতে পারি—কিন্তু এই পাওয়ার মধ্যেও প্রাচীর তুলে দাঁড়াচ্ছে—এরা কে? নয়—নয়—আমার পাবার নয় সে! —তাই-ই হরেন্দ্র যাবার সময়ে আমায় হঠাৎ এই বন্ধুত্ব-বন্ধনে বেঁধে গেল! সেই জন্যই 'দিদি'কে সঙ্গে এনে আমায় দান ক'রে গেল। তবে ভাগ্যের এ পরিহাস—এ বিদ্রূপ-হাস্য কেন?

কাকা যেতে লিখেছেন। গিয়ে তাঁকে কি বল্‌তে হবে? পারব না। আমি আমার নিজের জীবনের আশা, আনন্দ, সুখ—এক কথায় নিজের সর্বোত্তম সবকে মাথায় তুলে নিতে—ঘরে তুলে নিতে পার্‌ব না। সগুণাকেও আমি চাই না,—এও আমায় মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে? ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে হবে? এও যে আমি পার্‌ব না—পার্‌ব না!

কি হবে তবে? কি কর্‌ব তবে? কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। —কি লিখ্‌ছি—কি কর্‌ছি—কি বল্‌ছি—কাকে? কেউ না—কিছুই না!

'দিদি' এসেছিলেন এখনই। কি রকম করুণ আর অবাক্ চোখে তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন! আমার হঠাৎ কি হয়েছে, তাই ভাবছেন বোধ হয়। কাল কাকার চিঠি আসা আর সেটা প'ড়ে থাকাও তো তিনি দেখেছেন। না জানি কি ভাবছেন। কি সংযত সুন্দর স্বভাব! একটি প্রশ্ন ক'রেও আমায় উৎপীড়িত করছেন না; কিন্তু যেন একটু প্রতীক্ষার ভাব মুখে চোখে মাখা রয়েছে। আমি যেন আমার চিন্তার আর

সুখদুঃখের অংশ তাঁর কাছে কোন এক সময়ে ঢেলে দেবই, ঠিক সেই প্রতীক্ষায় যেন প্রস্তুত হয়ে আছেন। যথানিয়মে আমার খাওয়া শোওয়ার একটুও ব্যতিক্রম হ'তে দিচ্ছেন না।—কিন্তু সেও তো আমি পারবো না। ব্যাপারটা বাইরে থেকে কথার দ্বারা কি বোঝাবে? যেন আমি এই সুযোগেরই প্রত্যাশায় ছিলাম। তাই 'দিদি'র ভার নিজে নিয়ে তাকে বিলাত যেতে সাহায্য ক'রে পথের কাঁটা দূর করলাম। এখন নির্লজ্জের মত —ওঃ—না! যখন আমার কথা—কথা দিয়ে কাউকে বোঝাবার উপায় নেই, তখন কেন তাকে ভাষায় টেনে আনা? গানকে—সুরকে কি কেউ ভাষায় বোঝাতে পারে? পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের আর গোলাপের শোভা গন্ধ এ যে কিসে মানুষের চোখকে নাককে অভিভূত করে, সে কি মুখের কথায় বোঝাতে পারা সম্ভব? কেন গন্ধ ভাল লাগে, কেন রূপ ভাল লাগে—কেন মানুষ ভালবাসে—এই সব 'কেন'র উত্তর কি? আমি কেন এমন করলাম, এ তো কাউকে বোঝাতে পারব না।

১০ই। আর দেরী ক'রে কি হবে! এইবার 'দিদি'কে নিয়ে চলি!—পাততাড়ি তুলি।—অনেক দিন পরে আজ 'বিভাসে'র করুণ উদাস সুর অন্তরে বেজে উঠেছে।

"...... ......এবার চলিনু তবে,—
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

... ..."

.... নির্ম্মম আমি আজি,
আর নাই দেরী ভৈরব ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি আছ ঘুম নিমীল নয়নে—"

এখানে এসে সুরের ভাষা যে কোন্ আবর্ত্তে ঘুরে ডুবে যাচ্ছে! আমার সম্বন্ধে সে নিমীল নয়নে সত্যই ঘুমাচ্ছে। এ ঘুমের স্বপ্নের কোন কোণেও বোধ হয় আমার চিহ্নমাত্র নেই! যদি তার মধ্যে একবারও সে কেঁপে ওঠে, সে হরেন্দ্রেরই বিরহ-স্বপ্নে নিশ্চয় কেঁপেছে, তবে আর কেন আমার এই দ্বন্দ্ব! সগুণা যেমন হরেন্দ্রর বিষয়েও বাপের অমত বুঝে এমন নিরপেক্ষভাবে থাকলো—তেমনি বাপের অন্য আজ্ঞাতেও যদি থাকে, তবু আমি তাকে পাব কি? পাব হয় তো শুধু বাপের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সংযতস্বভাবা মেয়েটিকে! সত্যই কি সে একটা যন্ত্রমাত্র? এমন ব্যাপারে কি তার মনে কোন তরঙ্গ উঠছে না? বিশেষ যে অতখানি সুশিক্ষিতা বিদুষী? যা উঠছে, তা কখনই এ ক্ষেত্রে আমার অনুকূলে উঠতে পারে না!—না—না—এ লোভে কায নেই, হয় ত কেবল দ্বিগুণ যন্ত্রণাই সার হবে। "যা ফুরায়, দে রে ফুরাতে।"

রাত্রি। সকালে এই কথা লিখে গেছি, আর আজ সারাদিনের সন্ধ্যার কথা, এখনকার কথা, তাও লিখে রাখি আমার এই জীবন-খাতায়? ঐ 'যা ফুরায়, দে রে ফুরাতে' লিখে খাতা বন্ধ করতেই দেখি, কাকা এসে একেবারে আমার

কাছে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে অমন হঠাৎ দেখে আমি কি রকম হয়ে গেছিলাম, জানিনে—যাতে তিনি নিজেই আসন নিয়ে আমার পাশে ব'সে প'ড়ে "কি হয়েছে নীরেন্? আমার ঠিকই মনে হয়েছিল, তোমার কোন অসুখ করেছে। বল আমায়, কি হয়েছে?" ব'লে সস্নেহে মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন। আর তাঁর সেই সাদর সান্ত্বনায় আমার চোখ দিয়ে ছেলেমানুষের মত মেলা জল ঝ'রে পড়ছে দেখে একেবারে আমার মাথাটা প্রায় তাঁর বুকের উপরেই টেনে নিলেন। খানিকক্ষণ পরে আমি সামলে লজ্জিতভাবে উঠে বস্‌লে তখন তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, "আমার মনে তোমার ওপোরও যা একটু অভিমান জমেছিলো, তা ধুয়ে গেল। কিন্তু, নীরেন! এখন বল দেখি, ব্যাপারটা কি! কেন আমার চিঠি পেয়েও গেলে না? কথাটা বিশ্বাস করতে পারনি বুঝি? না?"

আমি তাঁর কথায় ঘাড় নেড়ে মাত্র সম্মতি জানালাম। তিনি তখন সস্নেহে হেসে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে কি আমি এই নিয়ে ঠাট্টা করতে পারি, বাবা? তোমার সে চিঠির কথা আমি কি ভুলে গেছি, মনে কর? তুমি যখনি সগুণাকে গান শোনাতে, গান শেখাতে, হরেন্দ্র আর তার সঙ্গে গল্প কর্‌তে, আমার বুকে ছুরী বিঁধ্‌ত! কি করব, একবার কথা দিয়ে ফেলে বিনা কারণে সে কথা তো উল্টাতে পারি না। আজ আর আমার সে বাধা তো নেই, আজ আমি তোমার বাবা থাক্‌লে এত দিন যেমন ক'রে তোমায় নিতাম, তেমনি আদর ক'রে

নিয়ে গিয়ে সগুণাকে তোমার হাতে দেব। ও কি—তুমি জোড়-হাত করছ? কেন, নীরেন—আবার কি বল্‌তে চাও তুমি?"

"মাপ করুন—আমায় মাপ করুন।"

"কেন—কি জন্ম? কিসের মাপ কর্‌ব তোমায়?"

"আমি বল্‌তে পারব না—শুধু মাপ করুন।" এর বেশী একটা কথাও আমার মুখে ফুটলো না। তিনি তখন যেন একটু আহত হয়ে খানিক স্তব্ধভাবে থেকে শেষে বললেন, "বুঝতে পারছি, এই হরেন্দ্র-ঘটিত ব্যাপারে তোমার সেণ্টিমাণ্টাল স্বভাবে কোথাও আঘাত পাচ্ছে। কিন্তু এও জেনো, যে আমার এত বড় অবাধ্য, তাকে আমি কখনই আর জামাই কর্‌ব না। সে ফিরে এসে যদি আমার পায়ে 'হত্যা' হয়, তবুও নয়। এই বুঝে তুমি যথাকর্ত্তব্য স্থির কর। হরেনের সঙ্গে তোমার এমন কোন বন্ধুত্বও নেই যে, যার জন্ম তুমি নিজের কাছেও লজ্জিত হবে! আমাদের ভাবী সম্পর্ক নিয়েই তো মাত্র তোমাদের মুখের আলাপ, সেটুকুও ভদ্রতার গণ্ডী কোন দিন যে ছাড়ায় নি এও আমি জানি তো? তবে কিসের তোমার এ আপত্তি?"

তবুও আমি মাথা তুল্‌তে পারছি না দেখে আবার তিনি বল্‌লেন, "তবে কি তুমি সগুণার সম্বন্ধেই কোন মত পোষণ কর? সে হরেন্দ্রর বিশেষভাবে পক্ষপাতিনী, এই রকম ভাবছ—আর সেই জন্মই তোমার এই অসম্মতি? আমি বল্‌ছি তোমায়, তোমার এ ধারণার কোন মূল্য নেই। আমি

বাপ, আমি কি তা বুঝতে পারতাম না? সে যেটুকু যত্ন-আতিথ্য তাকে দিয়েছে, তা কি তোমায়ও দেয় নি? আর যদিই কিছু দিয়ে থাকে, সেও আমারই আদেশে ত? তার সঙ্গে বিয়ে দেব জেনেই ত? সে যে আমার কি রকম বাধ্য আর শান্ত মেয়ে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বল্‌ছি, ও সব মিথ্যা ভাবনা ভেবো না। আজ সন্ধ্যায় তোমার আমার ওখানে নিমন্ত্রণ—বুঝেছ? আমি বল্‌ছি, তুমি এ রকম ভাবে না থেকে আগের মত যাবে—তাকে গান শেখাবে—তার পরে দু দিনে যদি তোমার এ ভ্রম ভেঙ্গে না যায় তো কি বলেছি! সন্ধ্যায় যেও—বুঝলে? আমি পথ চেয়ে থাকব—ভুলো না?" আমার আর কোন আপত্তি জানাবার অবসর না দিয়ে, এই ব'লে ঝড়ের মতই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তার পরে—সন্ধ্যায়ও আমায় একই ভাবে জানালার সুমুখে ইজিচেয়ারে প'ড়ে থাকতে দেখে 'দিদি' এসে বল্লেন, "ও কি, তুমি এখনো যাও নি?"

আমি শান্তভাবে প্রশ্ন কর্‌লাম, "কোথায়, দিদি?"

"কেন, ওঁদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে?"

বুঝলাম, তিনি সবই শুনেছেন। লজ্জার একটি ঝলক অন্তর ছেপে বাইরেও আত্মপ্রকাশ কর্‌তে আস্‌ছিল। অতি কষ্টে তাকে দমন ক'রে একই ভাবে উত্তর দিলাম, "নিমন্ত্রণে তো যাব না, দিদি।"

"সে কি! কেন যাবে না? উনি নিজে এসে নিমন্ত্রণ

ক'রে গেলেন যে! আমিও তো ঠাকুরকে তোমার নিমন্ত্রণ আছে ব'লে দিয়েছি।"

"ব'লে দেন আবার তাকে—নিমন্ত্রণ নেই।"

'দিদি' আর বাক্যব্যয় না ক'রে বোধ হয় মহারাজকে কিছু আদেশ দিতে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে একটা কাঠের চৌকী টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে শান্ত স্নেহমাখা মুখে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "নীরেন, আমি তোমার ঠিক্ 'দিদি' তো?"

"হ্যাঁ, দিদি।"

"তাতে কোন ভুল নেই ত, ভাই?"

"না।"

"তবে আমায় বল, কেন তুমি নিমন্ত্রণে যাবে না?"

বুঝলাম, তাঁর মত বুদ্ধিমতীর কাছে আর লুকোচুরি ঠিক নয়, কি জানি, তিনি হয় ত আন্দাজে আন্দাজে কত দূরই চ'লে যাবেন। তখনো নির্ব্বোধ আমি এটুকু বুঝি নি যে, যত দূর বুঝবার, এই ক'দিনে সবই তিনি বুঝে নিয়েছেন! যা বাকি ছিল, কাকার আজকের কথাবার্ত্তায় তা পূরণ করেছে। বল্‌লাম, "কেন, তা তো আপনি শুনেছেন, দিদি।"

"হরেন্দ্রর ওপর অন্যায় হবে ব'লে?"

"তাও বটে।"

"শুধু 'তাও বটে' নয়, ভাই; বুঝেছি, এইটাই তোমার আসল বাধা! কিন্তু কেন? হরেন তো তোমার বন্ধু নয়।"

"বন্ধু না হোক্, মানুষ।"

"যে কোন মানুষের জন্যই তুমি এই রকম ত্যাগস্বীকার কর্‌তে পার, নীরেন?"

আমি শুষ্ক হাসি হেসে বল্‌লাম, "ত্যাগস্বীকার? কি আমার আছে দিদি, যে তাই নিয়ে এই ত্যাগস্বীকার-টিকার, এত বড় বড় কথা আমার সম্বন্ধে খাট্‌তে পারে?"

"আছে কি না আছে, তার তো প্রমাণও নাওনি, ভাই। উনি যা লিখেছেন, ঠিকই; হয় ত সগুণা তোমারই বিধিনির্দিষ্টা বটেন। হরেন্দ্রর জন্য সে নয়। তাই হরেন্দ্র এমন কর্‌লে। তুমি আর ওঁদের কষ্ট দিও না—নিজেকেও কষ্ট দিও না। আমি তো হরেনের বোন্? আমি বল্‌ছি, তোমার এ ক্ষেত্রে কিছু দোষ স্পর্শাবে না। উনি তো হরেন্দ্রকে জানিয়েই দিয়েছেন এ কথা—আর তুমিও তাকে বোঝাতে কম কর নি—নিজের কানেই শুনেছি তো।"

"কিন্তু দিদি, হরেন বাবু তবুও এ কথা মনে কখনই কর্‌তে পার্‌বেন না যে, বিপন্ন অবস্থায় যাকে বিশ্বাস ক'রে—"

"তার দিদির ভার দিয়ে গিয়েছে, এই বই তো নয়? সে ভার তো তুমি কাঁধেই নিয়েছ! সগুণার ভার তো সে তোমায় দিয়ে যায় নি। আমার মনে হচ্ছে এখন, সে অধিকার তার ছিল কি না, তাও সন্দেহ। তা হ'লে কি সে এত নিশ্চিন্ত হ'তে পারত? আর আমাদের দেশের দশ বছরের মেয়েরা এ রকম করতে পারে বটে, কিন্তু সগুণার মত বয়স ও শিক্ষা

পাওয়া মেয়ের এ রকম উদাসীনভাব, এতে আমি সে দিন অবাক্ই হয়েছিলাম। সে দিন ওঁদের দু'জনের ব্যাপার দেখে সগুণার মতটা কি জান্তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে একটুও টলাতে পারি নি। আজ আমারও মনে হচ্ছে, তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই। তুমি তাঁদের নিমন্ত্রণ রাখতে স্বচ্ছন্দেই যেতে পার।"

তর্ক করবারও আর শক্তি ছিল না, বিদ্রোহের ক্ষমতাও যেন হ্রাস পেয়ে আস্ছিল। যেটুকু এতক্ষণ ছিল, 'দিদি'ই যেন তা লোপ ক'রে দিলেন, ক্রমশঃ।

একটু পরে দিদি বল্লেন, "তোমার বাবা আর সগুণার বাবা দুজনে বুঝি দু'জনের বেহাই হ'তে চেয়েছিলেন?"

আমি একটু গলা ঝেড়ে বল্লাম, "সে অনেক দিনের কথা।"

"যাক্, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গেছিল কে? তুমি নিজেই বুঝি?"

"হুঁ।"

'দিদি' একটু হাস্লেন। তার পরে বল্লেন, "সেদিন ওঁর যে চিঠিখানা নিয়ে তুমি অজ্ঞানের মত হ'য়ে বসেছিলে, তোমায় ডাক্তে গিয়ে তার ক'টি অক্ষরে হঠাৎ আমার চোখ পড়েছিল, ভাই। হরেনের হাতের-লেখা চিঠিতে আবার না জানি কি খবর এসেছে ভেবে, আমি অনিচ্ছায়ও সেদিকে চেয়ে ফেলেছিলাম একটু। তাতে দেখলাম, উনি সগুণাকে তোমার বিধিনির্দ্দিষ্টা ব'লে কি খানিকটা লিখেছেন। সেটুকু দেখে ফেলেছি ব'লে তুমি কিছু মনে করবে না তো?"

"না, দিদি ; তবে আপনি 'দিদি' কিসের ? ইচ্ছে করেন তো সবটাই এখন দেখতে পারেন।" ব'লে উঠে, চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি দু'-মুহূর্ত্ত সেদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তার পরে বল্লেন—শুধু এটুকু দেখে কি হবে? সব গল্পটা বল্‌তে পার, তবে ত বুঝি ছোট ভাই!"

নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লাম। এ-ও কি বল্‌বার মত কথা! লজ্জার সঙ্গে হেসে উত্তর দিলাম, "গল্প তো নেই কিছু, যেটুকু আছে তা তো আপনি বুঝতেই পেরেছেন দেখছি।"

"আমিই বলি তবে! সগুণাকে জানবার অনেক আগে দেশে থাক্‌তে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিলে, তার পরে এখানে এসে তাকে দেখে—"

"কিন্তু হরেনের সঙ্গে তখন এ সম্বন্ধের কথা আমি জান্‌তাম না।"

তিনি তখন একটু স্নেহের সঙ্গেই বল্‌লেন, "তাতেই আমার ভাইটি এমন ঘরছাড়া উদাসী! যাক্‌, ভাইয়ের বিয়ে দিতে এসে একেবারে শুধু হাতে ফিরে যাব না, এই একটু লাভ হ'ল। এক ভাইয়ের না হ'ল—আর একটি ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে দেশে যাব।"

যদিও হাসির সঙ্গে আর একটু মমতার সঙ্গেই কথাটি বল্লেন তিনি, তবু আমার মনে আবার কেমন একটা আঘাত লাগ্‌লো। মনে হ'ল, তাঁর ওপর মুখটি বিবর্ণ—আর নীচের মুখটিতে হাসি! আবার বল্‌লেন, "এইবার যাও তবে নিমন্ত্রণ খেতে।"

"আজকে আর নয়।"

১১ই। সকালে উঠে বেড়ানোর বেশেই একেবারে কাকার কাছে গেলাম। তিনিও বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন, আমাকে দেখে একটু অভিমানের সঙ্গেই যেন বল্‌লেন, "কাল রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

আমি সলজ্জে বল্‌লাম, "কাল বড় মাথা ধরেছিল,—আজকে যাব।"

"সগুণাকে ব'লে দিয়ে যাই,—এই বেলাতেই তো ?—চল, আমিও বেড়িয়ে আসি।"

খানিক দূর গিয়ে আমার দিকে ফিরে তিনি বল্‌লেন, "তোমার দ্বিধা দেখে, আমি কাল সগুণাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, হরেন্দ্র ফিরে এলেও আমাদের সঙ্গে আর তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কোন সুপাত্রে তাকে আমি দান করব।"

নিঃশব্দেই তাঁর কথা শুনে যেতে লাগলাম। হরেন্দ্রর উদ্দেশে কতকগুলি বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে আবার তিনি বল্‌লেন, "সগুণাকে এ-সব আমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। সে চুপ ক'রে শুনে গেল। আমার দুর্ম্মতিই যে, তোমার সেই চিঠি পেয়ে তোমার মন জেনেও, হরেন্দ্রর প্রত্যাশায় ছিল, সে-কথাও আমি তার কাছে স্বীকার করলাম। তখনি যদি মন ফিরাই, তা হ'লে কি এই কেলেঙ্কারীটি কপালে ঘটে! সবাই ত জেনেছে, বিয়ে না না ক'রে সে জোর দেখিয়ে বিলাত চ'লে গেল! এ কি অপমান নয়?"

আমার কথা, আমার সেই চিঠির কথা—সগুণাকে তাঁর বাপের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার কথা সব আজ জেনেছেন তা হ'লে সগুণা? কি ভাবলেন তিনি? বাপের কথার উত্তরে কি বল্‌লেন, তা তো এঁর মুখে একটু আভাসও পেলাম না। নিজে যা যা বলেছেন সগুণাকে, তাই কেবল অনর্গল তিনি ব'লে যেতে লাগলেন, আর লজ্জায়—ভয়ে—দুঃখে—আর কেমন একটা উৎ-কণ্ঠায় আমার ভেতরটা আবার সেই ধড়াস্ ধড়াস্ উথাল-পাথাল কর্‌তে লাগল। আর বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভবই হ'য়ে উঠলো। কাকা উত্তেজনার বশে দিব্য জোরে জোরে পা ফেলে চলেছিলেন, আর আমি কেবলই পেছিয়ে পড়ছিলাম! হঠাৎ এক সময়ে সেটা লক্ষ্য ক'রে তিনি বল্‌লেন, "আজও তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি দেখছি, চল তবে ফিরি। তুমি কিছু নিরুৎসাহ হ'য়ো না, সে আমার কথার ওপর কথা কইবার মেয়েই নয়। স্নানটা সেরে সকালেই এস। বুঝেছ? ডিসেম্বরের যে তারিখটা ঠিক্ করা আছে, সেইটাতেই—আমার ইচ্ছা! দেরী করার প্রয়োজন কি? এস তা হ'লে শিগ্‌গির—বুঝলে? যত শিগ্‌গির পার, স্নান সেরে নাও গে। আচ্ছা, এস।"

দুজনে ভিন্ন পথ ধর্‌লাম। কি বল্‌তে চান তিনি? এই অঘ্রাণেই?—এ কি সম্ভব? সগুণা কি শুনেছেন এ কথা? কি ভাবছেন তিনি এখন?—আমার সেই গানগুলো—তা[illegible] কি চিন্‌তে পার্‌ছেন তিনি এখন? তিনি কি ভাবছেন, আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই—?—না—না—এ তিনি কখনই ভাবতে

পারেন না! তাঁর বাবা যদি না তাঁকে বলতেন, এ কথা তো চিরদিনের জন্যই লুকানো থাকতো। তাঁকে তো কখনো আভাসেও এ কথা আমি জানতে দিই নি। তবে কেন তিনি তা ভাববেন?

তিনি এই কথাগুলিই কেবল ভাববেন? আর কিছু কি একবারও মনে করবেন না? মনে করবেন না কি—

আমায় যে স্নান ক'রে এখনই তাঁরই সুমুখে যেতে হবে, তাঁর হাতের পরিবেশন খেতে হবে। আজই কেন কাকা তাঁকে সব জানতে দিলেন? (এই সব কথা মনে ভাবতে গিয়েও কিন্তু মনে একটা দুঃখের হাসি আসছে। কি জানেন তাঁর বাবা? সবের কত—কতটুকু? মাত্র নীরেন তাঁর মেয়েকে চেয়েছিল, এইটুকু বই ত না?—কিন্তু এই কি মাত্র আমার সব কথা?) অন্ততঃ আজকের দিনটাও সেই আগের মত খেয়ে আসতে পারলেই যে ভাল ছিল।

স্নান ক'রে নিয়ে বেরুবার আগে 'দিদি'র সন্ধানে গিয়ে দেখলাম তিনি দুটি চারটি এই মরু-জাত ফুল-পাতা বাংলোর চারদিক থেকে সংগ্রহ ক'রে পূজোয় বসেছেন। তাঁকে আর অন্যমনা না ক'রে আমি চ'লে এলাম। ঐ রকম অসংখ্য আন্দোলনে মন সমানভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েই রইলো।—কাকা আদরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালেন, নিজেও পাশে বসলেন। মহারাজই প্রধানতঃ পরিবেশন করছিলেন, সুগুণাও এটা ওটা দিতে দিতে হঠাৎ একেবারে আমার দিকে চেয়ে

বল্‌লেন, "দিদি কোথায় আছেন? এখনো কি তাঁর দেশে যাওয়া হয়নি?"

আমার হ'য়ে কাকাই তখনি উত্তর দিলেন, "কি ক'রে আর যাবেন? নীরেন নিজের সুবিধামত যখন যাবেন, তখনই তো? সে এখনো কিছুদিন দেরী আছে।"

শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে সগুণা আবার প্রশ্ন করলেন—"এখনো কি আপনার যেতে দেরী আছে? শুনেছিলাম যে, শীগ্‌গির যাবেন?"

কাকা ব্যস্ত হয়ে এবারেও আমায় উত্তর দিতে না দিয়ে ব'লে উঠলেন, কে বল্লে তোমায় এ কথা? এখন কিসের জন্য অনর্থক দেশে যাবেন?—সে তখন—"

তাঁকে কোন রকমে থামিয়ে আমি ধীরে ধীরে উত্তর দিলাম, "তিনি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এ ক'দিন আছেন, যে দিন তিনি বল্‌বেন, সেই দিনই তাঁকে নিয়ে যেতে পারব।"

"তা ব'লে তোমার ডিসেম্বরের এদিকে যাওয়া হবে না, তা কিন্তু ব'লে রাখছি, নীরেন—সেই অগ্রাণের শেষে একেবারেই যাবে তোমরা! উনিও সেই সময়েই যাবেন, না হয়। থাকুন না কেন এ ক'টা দিন যেমন আছেন—তেমনি।"

সগুণা ধীরে ধীরে আবার বল্‌লেন, কাল আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব আপনার বাড়ীতে।"

"যদি বলেন, তাঁকে এখানেই নিয়ে আস্‌তে পারি, আপনি দেখা করতে চান্ বল্লেই তিনি আস্‌বেন।"

"না, আমি নিজেই যাব।"

কাকা এবার অসহিষ্ণুভাবে "আচ্ছা, আচ্ছা—সে তখন যাস্ আমার সঙ্গে; নীরেনের বাসায় তো তোর এদানী অনেক দিন যাওয়া হয় নি। কাল আমরা যাব, বুঝেছ, নীরেন? তোমায় ভাল ভাল গোটাকতক গান শোনাতে হবে। আজও সন্ধ্যায় এসে তুমি গান শোনাবে আর কাল্‌কের সন্ধ্যার ক্ষতিপূরণ কর্‌বে—বুঝলে?"

এই রকম উনি অনর্গল যা খুসী ব'লে যেতে লাগলেন, আর আমি সগুণার আনত মুখের পানে কয়বার চেয়ে নিলাম। মুখটা যেন একটু বেশী সাদা, মুখে কেমন একটা পরুষভাব, এরকম তো কখনো দেখিনি। জানি না, আমারও এ সন্দেহমাত্র কি না! শ্বেত পাথরের মত মসৃণ সুন্দর ললাটে কেমন একটা স্থির সঙ্কল্পের চিহ্ন, গণ্ডের অধরের আরক্ত আভার মধ্যে কেমন যেন বিবর্ণ ভাব। হঠাৎ আমার দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি মিল্‌তেই তিনি চোখ নামালেন। জানি না, চোখে কি দেখলাম! কি এ—চিনি না, জানি না! আমার সব জানার জন্যই কি এ সঙ্কোচ—লজ্জা? বিগত ঘটনার জন্য গ্লানি, অনুশোচনা? না, হরেন্দ্রর জন্য বেদনা? কিংবা সব জিনিষগুলো মিলিয়েই একটা রহস্যময় বিদ্যুৎবিকাশ! কি জানি।

সন্ধ্যা। খাওয়ার পরে বাড়ী এসে ঘণ্টা কতক বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসেছি, 'দিদি' এসে সহাস্যে "কি কি খেলে" ব'লে প্রশ্ন করলেন। ভোজ্যের লিষ্ট তাঁর কাছে দাখিল ক'রে সগুণা

তাঁর সম্বন্ধে যে যে কথাগুলো বলেছে—তাঁকে জানালাম। তিনি সকৌতুকে "আজ বুঝি 'দিদি'র খোঁজ পড়েছে?" ব'লে এমন একটু মিষ্ট হাসি হাসলেন, যাতে আমার মনের কেমন একটা শঙ্কিত ভাব মুহূর্ত্তেই উড়ে গেল। আমিও যেন আজ তাঁর এ সংবাদ লওয়ার একটি সরল অর্থ দেখতে পেলাম।

দিদি বল্‌লেন, "আসুক সে কাল,—বুঝিয়ে দেব তাকে যে, বৌ না নিয়ে আমি দেশে ফিরে যাব না।"—আমায় বল্‌লেন—"সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ আছে, তা তো এতক্ষণ বলনি, মহারাজকে বারণ করি তা হ'লে।"

আমি উত্তর দিলাম—"না, দিদি—এ বেলা আর নয়।—সকালে ওঁদের সঙ্গে ক'রে আন্‌তে যাব।"

"ওঁরা প্রতীক্ষা করবেন হয় ত।"

"তা করুন—আজ আর পারব না।"

১২ই। রাত্রি। আজকের কথাটাও লিখি। না হ'লে যে আমার সব কথার প্রধান কথাটিই বাকি থেকে যায়। সকালে উঠে গিয়েছিলাম তাঁদের বাংলোতে—তাঁদের সঙ্গে ক'রে আন্‌তে। সম্মুখেই সেই জানালাটা খোলা, যেখানে একদিন হরেন্দ্রর দিদির কাছে সগুণাকে দেখেছিলাম। আজও বুঝি সেই আশায় আমার অজ্ঞাতেই চোখ সেই পথে দৃষ্টি ফেল্‌তেই সে যা চেয়েছিল, তাই-ই পেলো! সগুণাই দাঁড়িয়ে আছেন বটে—জানালার রেলিং ধ'রে! আমার চোখের সঙ্গে তাঁর চোখ মিল্‌তেই এক মুহূর্ত্ত তিনি স্থিরদৃষ্টিতে বোধ হয় আমার মুখের দিকেই

চাইলেন। উঃ, এখনো মনে কর্‌তে অন্তর থর্‌-থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠছে! কি সে চোখ! বজ্র-বিদ্যুৎ-ভরা কালো মেঘে আঁধার কাল্‌বৈশাখীর আকাশের মত! ওষ্ঠ অধরের সেই যে অপরূপ ভঙ্গীর মধ্যে আরক্ত আভা, ঘৃণার বিষে তাও যেন কালিমাখা হ'য়ে উঠেছে! একটা প্রস্তরের কঠিনতা যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থেকে ফুটে উঠছে, আর কান, নাক, গাল দুটো দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে! তীব্র তীক্ষ্ণ ঘৃণার আগুন-ভরা চোখে দু' এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চেয়ে তার পরেই তিনি পাশে স'রে গেলেন।

কতক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, জানি না—কাকা এসে আমার বাহু ধ'রে নাড়া দিয়ে বল্‌লেন, "ঘরে এসো—অনেক কথা আছে।"

তাঁর মূর্ত্তিও বিশৃঙ্খল—বিষম উত্তেজিত। এক রকম টেনেই প্রায় আমায় তাঁর ঘরে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে বল্‌লেন, "শোন, আমার শান্ত বাধ্য মেয়েটির কথা শোন!" তিনি বল্‌লেন, আমার আদেশ তিনি এক রকমে পালবেন—হরেন্দ্রকে বিয়ে কর্‌তে না অনুমতি দিই—বিয়ে কর্‌বেন না,—কিন্তু আজীবন কুমারী থাক্‌বেন। আমি বলেছি, তাকে বিয়ে কর্‌তেই হবে তোমাকে, এই অঘ্রাণ মাসে—সেই তারিখেই! তাতে উত্তর দিয়েছে—প্রাণ গেলেও সে তোমার মত লোককে বিয়ে কর্‌বে না—এ'তে তার কপালে যাই ঘটুক।"

জড়ের মত আমি শুনে গেলাম। ভাবনা, বেদনা তখন

আর আমার কিছু নেই—সব অনুভবের শেষ হ'য়ে গেছে যে তখন। তিনি আবার হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "কিন্তু কত বড় স্বাধীন আর শিক্ষিত মেয়ে সে হয়েছে, আমি দেখে নেব। যদি আমার কথা না রাখে, সে আমার ত্যাজ্যা! আমার মেয়ে নেই!—সে চ'লে যাক্, যা খুসী করুক, কোন সম্বন্ধ নেই তার আমার সঙ্গে! দূর হোক সে আমার বাড়ী থেকে।—"

আবার সেই শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি, একটা জড় আর একটা উন্মত্তের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো; সুদৃঢ় স্বরে বল্‌লো, "তাই হবে, বাবা, আমি এখানকার গার্ল বোর্ডিংয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রুক্মিণী বাঈ পিসীমার কাছে যাচ্ছি। পুনায় তিনি আমার পিসীমা হতেন, তাঁর কাছে—"

বাপ উন্মত্তের মত লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন, "তোর যেখানে খুসী যা, অকৃতজ্ঞ হতভাগা মেয়ে—।"

সগুণা তাঁর উদ্দেশে একবার মাথা নামিয়ে তার পরে বাংলো থেকে নেমে রাস্তায় পড়তে যাচ্ছেন দেখে আমার সে জড়ভাব তখন ছুটে গেল। তখনই ছুটে তাঁর সাম্‌নে গিয়ে দু'হাত জোড় ক'রে "আমার একটা কথা শুনুন—" বল্‌তে না বল্‌তেই তিনি সবেগে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করলেন—"স্বার্থপর, নীচ।" তার পর সোজা রাস্তা বেয়ে এক দিকে অদৃশ্য হলেন।

কটু পরে চেয়ে দেখি, কাকা সেই উন্মত্ত মূর্ত্তিতেই আমার

দু'হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌ছেন—"আজ থেকে তুমি আমার ছেলে—তুমি আমার মেয়ে। এস, তুমি আমার ঘরে এস।"

১৪ই নভেম্বর।—এমন জড়ের মত প'ড়ে থাক্‌লে ত চল্‌বে না! পালাতে হবে, এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। নৈলে সগুণা ভাববেন, "নীচ স্বার্থপর" এখনও তার স্বার্থপরতার জাল বিস্তার ক'রে তাঁর বাবার পাশে ব'সে তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়ে হরেন্দ্রর অনিষ্টের চেষ্টা করছে আর তাঁদের এমনই ক'রে পর ক'রে দিচ্ছে। হরেন্দ্রর উপর কাকার এই অসম্ভব রাগ এবং মেয়ের উপর এই অযথা উৎপীড়ন—এ সব আমার প্ররোচনাতেই যে হচ্ছে, এতে সগুণার নিশ্চয়ই সন্দেহমাত্র নেই।

"নীচ স্বার্থপর?" হাঁ, এইমাত্র সম্বল নিয়ে, এই উপহার নিয়ে যাত্রা করতে হবে চিরদিনের মতই এবার! জীবনের সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত এই আমার ধন্বন্তরি কলসের সার বস্তু! মোহিনী মায়ার পরিবেশিত ভোজ্য-পেয়! লক্ষ্মীর করের বরমাল্য, চন্দ্রের পূর্ণতম তিথি। এই-ই আমার এ যাত্রার শেষ ফল! 'নীচ স্বার্থপর!' বাসুকির নিশ্বাসে সে দিন যতটা জ্বালা—যতটা বিষ বেরিয়েছিল, তার সবটা নিয়েও কি এতখানি হয়েছিল? এতখানি?—উঃ!

উঠ্‌তে হবে—যাত্রার বন্দোবস্ত করতে হবে, দিদিকে বল্‌তে হবে। সেই পরশু কখন্ ঘরে ফিরেছি, রাত্রে কখন্ খাওয়ায়

সে-দিনের এ কথাগুলি লিখেছি, কিছু মনে নেই। কা'ল সমস্ত দিনরাত্রি কই দিদির সঙ্গে তো কোন কথা হয় নি, চোখোচোখিও না। উঠি, বলি তাঁকে! এইটুকু লিখে রাখি আজও। উঠতে পারছি না যে!—কেমন যেন লাগছে।

ওঃ, বড় যন্ত্রণা মাথায়, কি জ্বালা সর্ব্বাঙ্গে! আর একটু লিখে রাখি—যতক্ষণ পারি। দিদি খানিক আগে এসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন! কপালে হাত দিয়ে বল্‌লেন, "এ যে ভয়ানক গরম!" তার পরে আমাকে বিছানায় শুইয়ে মাথায় জলপটী দিয়ে বাতাস দিতে লাগলেন। শোবার সময়ও খাতা আর কলমটা পাশে নিয়ে শুলাম দেখে বল্লেন, "যদি এখানা লিখবে, এর ওপরেও যদি আরও মাথা খাটাবে, তা হ'লে খাতা-কলম কেড়ে নেব, কিন্তু।" 'নেব না' ব'লেও যে নিচ্ছি, বুঝতে পারছি, কি রকম যেন আসছে মনের ওপর কালো পর্দ্দার মত ছেয়ে। দিদি বল্লেন, 'খুব জ্বর, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা।' বল্লাম তাঁকে, 'সব ঠিক ক'রে নাও দিদি, কা'ল আমরা বেরুবো এখান থেকে।' দিদি বল্লেন, 'সে হবে এখন, চুপ কর তো তুমি, মুখ বুজে শুয়ে থাক খানিক। পরশু থেকেই বুঝছি, তুমি একটা কাণ্ড করবে। কা'ল যাবে কি কত দিনে বিছানা থেকে উঠবে, তাই দেখ।' 'না—না, কা'ল—কা'লই—কা'লই যেতে হবে' ব'লে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, এইমাত্র মনে আছে। তার পরে—চাকরাণীকে বাতাস করতে দিয়ে উঠে গেছেন কি তিনি? লিখে রাখছি

একটু—যতক্ষণ পারি। না—এ কি? হচ্চে না, আর না। ওঃ—ওঃ—মাথায়—"নীচ—নীচ—নীচ—! স্বার্থপর!"

১৫ই ডিসেম্বর।—কত দিন পরে? ওঃ, ঠিক এক মাস! ভাল হয়েছি, পথ্য করেছি ক'দিনই, তবু নিজেকে একটা পাখীর মতই মনে হচ্ছে। কত মিনতি ক'রে দিদির কাছ থেকে এখানা চেয়ে নিয়েছি, দশ পনেরো মিনিটের বেশী রাখতে পাব না। তিনি এখনই এখানা এসে কেড়ে নেবেন ব'লে গেছেন। অসুখের মধ্যেও নাকি আমি এ'কে কাছ-ছাড়া করিনি, আঁকড়ে থেকেছি, আর আঙ্গুল দিয়ে লেখার মত করেছি এর গায়ে। তাই তিনি এটুকু অনুমতি দিয়েছেন।

কাকা আসেন দুবেলা, অসুখের সময় নাকি দিনরাতই প্রায় থাকতেন। দিদিই তাঁকে ডাকিয়ে আনান বোধ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি, 'ব্রেন ফিবার' হয়েছিল। ঘাড়ের একটা শিরা কেটে মাথার সে ঊর্দ্ধগ রক্ত বা'র ক'রে দিতে হয়েছে, তার পরে রীতিমত ব্যায়রামও গেছে খুব। এই ক'দিন মাত্র এ কথা তিনি বলেছেন। এখনই এসে কত কি ব'লে গেলেন। আমায় এ বাসা ছেড়ে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে হবে। দু'তিন মাস এখনও আমি কোথাও নড়তে পাব না। দিদিকেও আমার কাছে থাকতে হবে। ভাগ্যে এই মেয়েটি এ সময়ে এখানে এসেছিল, তাই আমার প্রাণটা পাওয়া গেছে।

নিজের আত্মীয় ছাড়া পরকে যে এমন যত্ন কেউ করতে পারে, এ তাঁর ধারণাই ছিল না। তিনি এই রকম অনেকই বলেছেন। আমি বলেছিলাম, উনি যে আমার 'দিদি'।

১৭ই ডিসেম্বর।—এত দিনে আমার 'জীবন-খাতা' দিন তারিখের হিসাবমত চলেছে। বেহিসাবীর দিন তাব কেটে গেছে কি না! এখন সবই হিসাবমত! এ হিসাব আরম্ভও হয়েছে সেই হরেন্দ্র এবারে আসার দিন থেকে।—যাক্।

দিদি শুনেছেন কিছু, তবু সবটা জানেন নি বুঝলাম। আমায় প্রশ্ন করলেন, "নীরেন, দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করি যদি, উত্তর দিতে পারবে?"

"কেন পারব না দিদি, এখন তো আর আমার কোনো কষ্ট নেই।" বুঝলাম, আমার অজ্ঞানের মধ্যেও তিনি আমার খাতার একটা পাতাও খোলেন নি। তাঁর ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠলো।

দিদি চিন্তিত মুখে বল্লেন, "আরও দু'চার দিন পরে এ সব কথা কইলেই ঠিক্ হ'ত বোধ হয়; কিন্তু হয় ত যত দিন যাচ্ছে, ততই বেশী অন্যায় হচ্ছে।" তার পরে একটু থেমে বল্লেন, "কি হয়েছিল?" আমি খানিকক্ষণ চোখ বুজে সাম্‌লে নিয়ে উত্তর দিলাম, "আপনার এটুকু আন্দাজ করা উচিত ছিল, দিদি।"

"না, এ যে বে-আন্দাজী ব্যাপার! এতটুকুও এর রূপ আগে তো বোঝা যায় নি।"

"কিন্তু এই তো সম্ভব। আপনারা যা বলেছিলেন, তাই-ই

অসঙ্গত অসম্ভব কথা। আপনি কি ক'রে জান্‌লেন দিদি? কাকা কি কিছু বলেছিলেন?"

"তোমার খুব বাড়াবাড়ি অসুখের সময় আমিই ব্যস্ত হ'য়ে আর একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাঁকে বলি, সগুণা এক দিনও নীরেনকে দেখতে আসছে না যে? তাতে তিনি বল্‌লেন, 'সে তার পিসীর কাছে বোর্ডিংয়ে গেছে।' এই মাত্র শুনেছি। তাঁর মুখ দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে একদিনও সাহস হ'ল না। সে কি আবার পুনায় গেছে?"

"না—এইখানেরই মেয়ে-স্কুলের বোর্ডিংয়ে।"

"এই এক মাসের ওপর সেইখানেই আছে?"

"সে কথা তো আমি বল্‌তে পারব না, দিদি। আমি তো সেই দিনের কথা মাত্র জানি, তার পরের আর তো কিছু জানি না।"

"আঃ, মেয়েটার হরেন এত শত্রুও ছিল! তা'কে ঘরছাড়া, বাপের কোলছাড়াও হ'তে হ'ল শেষে!"

"হরেন, না দিদি, সে আমি। আমারই ভয়ে তিনি গৃহত্যাগী হয়েছেন, বাপের ত্যাজ্য হয়েছেন।"

"আমায় আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারবে কি সব কথা?"

"এতে অস্পষ্টের কিছুই তো নেই, দিদি। তাঁর বাপের চেষ্টা আর ইচ্ছার জোর তো দেখেছিলেন! তিনি এখনই অঘ্রাণের তারিখটাতেই——"

"বুঝেছি, এতটা তাড়াহুড়া করাতেই এ কাণ্ডটা ঘটলো। তিনি যদি একটু ধৈর্য্য ধর্‌তেন।"

"তাতে অন্ততঃ তাঁকে ঘর-ছাড়া হ'তে হ'ত না, এই পর্য্যন্ত! কাকা তাঁকে যা বলেছেন, তাতে এ ভিন্ন গত্যন্তরই বা কি ছিল সগুণার ?"

"এত দূর ? আঃ—সে তা হ'লে এখনও ফেরেনি ব'লেই মনে হচ্ছে নীরেন। কাকার মুখ দেখেও এই-ই বোধ হয়।"

"আমি যত দিন এ দেশ না ছাড়ব, তত দিন হয় ত তিনি ঘরে ফিরবেন না, দিদি।"

"পাগল আর কি! বাপের এতদিন আদর ক'রে ডেকে আনা উচিত ছিল। তুমি এ দেশ ছেড়ে গেলেও বাপ না ডাকলে সে কি ঘরে আসবে ? তা'রা কৃতবিদ্য মেয়ে, নিজেদের জীবিকার সংস্থান স্বচ্ছন্দে করতে পারবে যখন, তখন আমাদের মত অন্যায় নির্য্যাতন সইবেই বা কেন ?"

"তবু আমায় যেতে হবে, দিদি—শীগ্গিরই !"

"অন্ততঃ আরও দিন পনেরো না হ'লে তুমি এই দূর-পথের যাত্রায় বেরুতেও পরবে না, আর তা তোমায় দেওয়াও হবে না। আচ্ছা নীরেন, আর একটা কথা বলব ?"

"বলুন।"

"অজ্ঞানের মধ্যে তুমি যত যা ব'লে চেঁচিয়ে .ত—তা'র মধ্যে 'নীচ' আর 'স্বার্থপর' এই দুটো শব্দ তু মি—ও কি, মুখ ঢাকছ কেন ? থাক্ নীরেন, এ কথায় আর কাজ নেই, এস অন্য কথা কই !"

একটু পরে আমি বললাম, "বলুন।"

"তুমি আর একটু বল পেলে আমায় একদিন সেই মেয়ে-বোর্ডিংয়ে নিয়ে যাবে ?"

আমি কেঁপে উঠলাম! আমি যাব, আমারই জন্য সগুণা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেইখানে ?

"না দিদি, এইটি বাদ আর যা বলেন।"

"কেন ? সগুণাকে যা উৎপীড়ন করবার, সে তার বাপই করেছেন, তুমি যে নির্দ্দোষ, তা কি সগুণা জানে না ?"

"আমি তো নির্দ্দোষ নই, দিদি।"

"তবে কি দোষী ? আচ্ছা, সে তুমি যা খুসী হও—কিন্তু আমার একবার তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বাপে মেয়েয় এত বড় কাণ্ড হ'ল—আর তা আমারই দুই ভাই নিয়ে, আমার কি এখানে উপস্থিত থেকেও এমন চুপ ক'রে থাকা উচিত ? তোমার অক্ষমতার জন্যে য'টা দিন আরও দেরী হবে, তার পরে আমায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে না কি ?"

"তা কি পারবেন দিদি ? তাঁর বাপ না ডাকলে তিনি যে আসবেন না, তা তো আপনিই এখনই বললেন।"

"পারি না পারি, চেষ্টা দেখতে হবে তো!"

"কিন্তু আমি যে তাঁর সুমুখে আর যেতে পারি না, এটুকুও বোঝা উচিত আপনার।"

"কেন পারবে না—নিশ্চয় পারবে। আমরা গিয়ে বলব—আমরা দেশে যাচ্ছি, তুমি তোমার ঘরে ফিরে এস! আর তাও তুমি বলবে না—আমি বলব। তুমি কেবল আমায় তার সঙ্গে

যাতে দেখা হয়, তারই বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। চাই কি, তুমি দেখা না করতে চাও—তাই কর! বাইরে স'রে থেকো।"

আমি ক্ষণিক ভেবে বললাম, "সে অন্য কারোর সঙ্গে আপনাকে পাঠালেও তে চল্‌তে পারবে দিদি। আমি বোর্ডিং-সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে পত্র লিখে—না, তাও ভাল দেখাবে না! তাঁর বাপ দেখা করতে যান না, হয় ত পত্রও লেখেন না, আর পর আমরা, আমাদের এ আত্মীয়তার চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে হয় ত অসম্মানজনক হবে। আপনি এমনই গিয়ে সগুণাকে ডাকিয়ে দেখা করুন,—সে স্বচ্ছন্দেই হবে।"

"তা তো হবে, কিন্তু যাব কার সঙ্গে? কার সঙ্গে আমি যেতে পারি তুমি ছাড়া?"

আমি মাথা হেঁট করলাম। সত্যই এ কথা? স্বার্থপরের মত নিজের কথাই ভাব্‌ছি কেবল। "আচ্ছা দিদি, তাই হবে। কবে যাচ্ছেন?"

"আর একটু সুস্থ হ'য়ে নাও!"—দিদি সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন।

সত্যই আর একটু সুস্থ হই। পারব না, এখনও পারব না।

১৮ই ডিসেম্বর।—কাকাকে আজ একটু জানালাম দিদির কথা। তিনি যে সগুণাকে বুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তে চান, এটুকু শুনে গোঁ গোঁ ক'রে দু'চার বার "দরকার নেই, অমন মেয়ের আমার দরকার নেই আর" বল্‌তে বল্‌তেও আমার বক্তব্যটা শুন্‌ছিলেন, তার পরে যে-ই শুন্‌লেন, আমি দেশে চ'লে যাব শিগ্‌গিরই,

তখন একেবারে অসংযত হ'য়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "কিছু দরকার নেই—তোমাদের এই সব ব্যাপারের। আমার ঘরে সে মেয়ের আর যায়গা হবে না। তোমরা যদি এ রকম ক'রে তাকে ফিরিয়ে আনো, জেনো, তার আর আমার কপালে আরও দুঃখ—আরও কেলেঙ্কারী ঘটতে বাকি আছে।"

তাঁর ভাবে আর স্বরে এ কিছুমাত্র অসম্ভব বোধ হয় না। আমি স্তব্ধ হ'য়ে আছি। তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ভাবে তিনি বল্‌লেন, "তুমি তা হ'লে সত্যই চ'লে যাবে?"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে তিনি আবার বল্লেন, "মেয়েটিকে তুমি যদি পাঠাবার জন্যই যেতে চাও, আমি সে জন্য বিশ্বাসী লোক দিতে পারি—"

"না, আমায় এই বার যেতেই হবে, কাকা," বলায় তিনি খানিক চুপ্ ক'রে থেকে ব'লে উঠলেন, "তা হ'লে তুমিও আমায় ত্যাগ করবে, নীরেন?—তুমিও?"

চোখ তাঁর অশ্রুপূর্ণ। এ কি বিসদৃশ স্বভাব তাঁর! আপনার সন্তানের প্রতি এই ঘোর অবিচার, আর পরের ওপর এ কি অহেতুক স্নেহ! কিন্তু এই অসুখ হ'য়ে মনটা এমন তরল হ'য়ে গেছে যে, চোখে জল দেখলেই নিজের চোখেও জল আসে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে জলটা মুছে ফেল্লেও তাঁর কাছে ধরা প'ড়ে গেলাম। তখন তিনি যেন জোরের সঙ্গেই ব'লে উঠলেন, "কক্‌খোনো যেতে পাবে না—এই বুড়োকে এমনি ক'রে একা ফেলে যাও দেখি তুমি! তোমার উপর সে অবিচার কর্‌লে

ব'লে আমি তার মুখ দেখ্‌ছি না, আর সেই তুমিই আমায় ত্যাগ কর্‌বে? না না, তুমি যেতে পাবে না।"

২৫শে ডিসেম্বর।—দিদিকে বুঝিয়েও থামাতে পার্‌ছি না। তিনি সগুণার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবেনই। তাঁর বিশ্বাস—সগুণা যদি রাজি হন, ঘরে ফিরে এলে বাপ কখনই মেয়েকে আর কিছু বল্‌তে পার্‌বেন না। আমাদের এই কর্ত্তব্যটা সারা হ'লেই আমরা চ'লে যেতে পার্‌ব। এমন ক'রে তাকে ঘরছাড়া অবস্থায় ফেলে রেখে তিনি কি ক'রে যাবেন?

কথাটা সত্য বটে। যাক্—যখন অন্য উপায়ই নেই, তখন যত দুঃখই হোক্, কর্‌তেই তো হবে। যাই কা'ল দিদিকে নিয়ে বালিকা বোর্ডিংয়ে! দূরে থাক্‌ব, তা হ'লেই দেখা হবে না! পাছে দেখা হ'য়ে যায়, এই ভয়টাই সব চেয়ে বেশী হচ্ছে। সে ধাক্কা কি সাম্‌লাতে পার্‌ব? নির্লজ্জের মত আবার আমি তাঁর কাছে যে গিয়েছি, সে তো বুঝতেই পার্‌বেন! দিদিকে বারণ ক'রে দেব এ কথা বল্‌তে? কিন্তু তাতে যদি কোন রকমে তাঁকে মিথ্যা বল্‌তে হয়? এ অনুরোধ কি করা চলে? ছেলেমানুষী—অভিমানের মত যেন দেখায়! ছিঃ—হোক্—এও সইতে হবে।

২৬শে ডিসেম্বর।—গিয়েছিলাম দিদিকে সগুণার সঙ্গে দেখা করিয়ে আন্‌তে। সগুণা গার্লস্কুলের এক জন শিক্ষয়িত্রীর পদ নিয়েছেন, আর সম্মানের সঙ্গেই সেখানে আছেন শুনলাম। 'দিদি' তাঁর নাম কর্‌তেই ক'টি মেয়ে বোর্ডিংয়ের হেড্‌-মিষ্ট্রেসের কাছে হুকুম নিতেও না গিয়ে একেবারে তাদের নতুন

টিচারের কাছেই দৌড়ুলো, আর এক জন 'দিদি'কে সসম্মানে বসতে চৌকী দিলে! আমি আস্তে আস্তে বাইরে চ'লে এলাম। ৮

হাতার একদিকে একটু একটু পায়চারী করতে করতে সময়টা কাটিয়ে নিলাম। তখন স্কুলের ফেরত মেয়েরা বোর্ডিংয়ে আসছে। এই দেশের এই সুন্দর আবহাওয়াটি সস্পৃহ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। তাঁরা সব হিন্দুর ঘরেরই মেয়ে। রবি বর্ম্মার স্ত্রী-ছবির মত কারও কারও কপালের মাঝখানে সিঁদুরের মোটা টিপ; সেগুলি নিশ্চয়ই বিবাহিতা! উচ্চ ঘরের উচ্চ বর্ণের মেয়েরাই এর মধ্যে বেশীর ভাগ আছে। তবে এখানে কলেজ নেই—প্রবেশিকা মাত্র পাশ দেওয়া চলে; তাই বেশী বয়সের মেয়ে তত বেশী নেই। এঁদের বিয়েও বয়স হ'য়েই হয়, তাই এর মধ্যে বিবাহিতা দুটি তিনটি মাত্র দেখলাম। যে তিন চার জনের বয়স একটু বেশী বোধ হ'ল, ভাবে বোধ হ'ল, তাঁরা টিচার। কি অসঙ্কোচ-গতি আর ভাবভঙ্গী! আমাদের দেশের যাঁরা ধর্ম্মের পর্য্যন্ত একটু নামান্তর নিয়ে তবে এই রকম স্ত্রীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারেন, তাঁরাও এ দেশের মেয়েদের মত এ রকম শরীরের রক্ত-অস্থিমজ্জাকে পর্য্যন্ত স্বাধীন ক'রে তুলতে পারেন না। এমন একটু সঙ্কোচ তাঁদের মধ্যে থেকেই যায়—যাতে তাঁদের কাছে গেলেই তাঁরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে, তা বেশ ধরা পড়ে। এঁরা যেন পুরুষেরই মত একটা সঙ্কোচহীন—লজ্জার সংস্কারমাত্রহীন জাতি! হাত, পা, মাথা, মুখ খোলা, স্বাধীনতার নামান্তরে বস্ত্রের একটা বোঝা হওয়া নেই,

দেশের দশের সঙ্গেই অবস্থা মিলানো একখানা শাড়ী আর এক এক হাতকাটা জামা (চোলি) গায়ে, চলন-ফেরন পর্য্যন্ত এমন নিঃসঙ্কোচ—যাতে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু পীড়ার মতই লাগে যেন। পুরুষমানুষের মত কাছায় কোঁচায় এ যেন চিত্রাঙ্গদার দেশের বা দ্বিতীয় প্রমীলার পুরীর মেয়েরা! কারও দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে নগ্নপদে নগ্নমস্তকে বগলে এক এক গোছা বই নিয়ে ঠিক আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্রদের মত দীর্ঘ পদ-বিক্ষেপে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছে। আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের একটা দুর্ব্বলতা যা বেশীর ভাগ মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়—সেই সুন্দর দেখানোর চেষ্টা—কেমন দেখাবে, তার দিকে একটা উৎকণ্ঠ দৃষ্টি, সেটা বোধ হয়, এরা একেবারে জানেই না। মেয়েদের যে পুরুষদের কাছে এই একটা মুখ-প্রেক্ষিতার বিষয় আছে, চালচলনে তাদের মধ্যে এ যেন বোঝবারই পথ নেই। আমাদের জন্মগত সঙ্কোচে আমি তাদের পাশ থেকে একটু দূরে দূরে রয়েছি, আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেও অন্তত্রে স'রে গিয়েছি, এ দেখে তারা একটু বিস্মিতভাবেই যেন আমার দিকে চেয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন টাঙ্গাওয়ালা আমায় বিরক্তির চরম-সীমায় তুলেছে, তখন দিদি বেরিয়ে আসছেন দেখলাম আর দেখলাম, তাঁর সঙ্গে সগুণা। বোধ হয়, জেনেছিলেন কিংবা আন্দাজই করেছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়নি। ভাগ্যে আমি টাঙ্গাটার কাছেই তখন দাঁড়িয়েছিলাম,

তাই তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিকটা এসে দিদি বল্‌লেন, শুন্‌তে পেলাম, "আর দরকার নেই, যাও, জল খাওয়ার সময় যাচ্ছে, ফিরে যাও এইবার! আচ্ছা, আস্‌তে আর একদিন চেষ্টা করব,—যাও।" সগুণা বোধ হয়, ফিরে গেলেন; কেননা, টাঙ্গার সম্মুখের আসনে যখন দিদির আদেশে উঠে বসার পর টাঙ্গাটা চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো, তখন একবার সেইদিকে চেয়েছিলাম। খোলা বারান্দায় দু'একজন মহিলা যাওয়া-আসা কর্‌ছেন, এইমাত্র দেখতে পেলাম। আর কিছু না।

বাসায় পৌঁছে দিদির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "চেষ্টাটা মিথ্যাই হবে ব'লে বুঝলেন কি, দিদি?" দিদি উত্তর দিলেন, "ঠিক্ বুঝতে পারলাম না। বাপ একটু নরম হ'লেও ভাল হ'ত। সগুণা জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবা কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তা যখন পাঠাননি, তখন কেন আর এ কথা! আমার দিকের বাধা তো কিছুই নেই, তিনি আমায় নির্য্যাতন না করলেই আমি আবার ফিরে যেতে পারি। তাঁর ওপোর আমার তো রাগ নেই'।"

এই নির্য্যাতনকারীই মাত্র তাঁর রাগের পাত্র। সে তো জানা কথাই! তবু কেন এটুকু শুন্‌তে এমন মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুতের বাড়ি পড়ে! দিদি বল্‌তে লাগলেন, 'এই ব্যাপারে তোমার মন যখন বাবা জেনেছেন, তখন আর নিশ্চয়ই নির্য্যাতন করবেন না, তুমি ফিরে চল।' আমি এই কথা বল্লাম যখন, তখন সে বল্লে, 'তিনি নিজে আমায় নিতে আস্‌তে না

পারেন, একখানা পত্রও তো দিতে পারেন ? তা না যতদিন দিচ্ছেন, ততদিন কি ক'রে ফিরে যাই দিদি ? যদি আবারও এই অশান্তি বাধে ?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আর বাধবে না, কেন না, যাকে নিয়ে বেধেছিল, তাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই আমি দেশে যাচ্ছি ! তুমি তোমার বাপের কাছে গেলেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমরা চ'লে যেতে পারি।' তাতে সে বল্লে, 'আমার জন্মে আপনি কেন ভাবছেন ? দেখছেন না, আমি ভালই আছি।' 'তুমি তো ভাল আছ, কিন্তু তোমার অন্ন সম্বলহীন বুড়ো বাপ, তাঁর কথা ভাব কি ?' এই কথায় মুখ রাঙা ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, 'না, আমার তাঁর এখন না হ'লেও চল্‌বে।'

আমি নিঃশব্দে চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিলাম। তিনি চুপ কর্‌লে বল্লাম, "এইবার তো আপনার ঝোঁক মিট্‌লো, চলুন এইবার আমরা যাই।"

"আমি যাওয়ায় খুব খুসী হয়েছে কিন্তু সগুণা। বল্‌লে, 'যদি আপনার থাকার উপায় থাকতো দিদি, আমি আপনাকে এই দেশে থাকতে বল্‌তাম। মাঝে মাঝে তবু আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত !' আমি বল্‌লাম, 'তুমি নিজের বাপের কাছে না গেলে আমি দেশে যেতেই পার্‌বো না। এ শুন্‌লে হরেন আমায় কি বল্‌বে না যে, তুমি কেন তাকে তবে সঙ্গে ক'রে আমাদের বাড়ী নিয়ে গেলে না ? এমন ভাবে রেখে ব'লে চ'লে গেলে ? তাতে সে একটু চুপ ক'রে থেকে আমায় কি অনুরোধ করলে জান, নীরেন ? পারি যদি, এ সব কথা হরেনকে

যেন না লিখি। আমি যে লিখে দিয়েছি হরেনকে, সে কথা বল্লাম তাকে। আমায় বলেছিল, আর একবার আসবেন! আমি তখন বলতে বাধ্য হলাম যে, আমি তো একা আস্‌তে পারব না, সঙ্গে যাকে এনেছি, তাকে এ কষ্ট আর আমি দিতে পার্‌বো না। সে আমার দায়েই এসেছে, নৈলে'—

বাধা দিয়ে বল্লাম, "এ কথাটা না বল্লেও চল্‌ত দিদি।"

"চল্‌তো জানি, কিন্তু তার আগেই তোমার এই বিষম অসুখের জন্য এই দেড় মাস যে আমাদের দেশে যাওয়া হয়নি, সে কথাটা তার কথার উত্তরে ত ব'লে ফেল্‌তে হয়েছিল! তাই এটুকুও বল্‌তে হ'ল।"

"যাক্, এইবার আর দেরী ক'রে কাজ নেই, দেশে চলুন দিদি।"

"এবারের বিলাতের ডাকের দিনটা দেখে হরেনের চিঠিটা পেয়ে তবে গেলে ভাল হ'ত না?"

"সেও আর বেশী দেরী নেই। তাই না হয় যাওয়া যাবে।"

হরেন্দ্রর যথাসময়ে নিরাপদে ইংলণ্ড পৌঁছানো এবং একরকম স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে স্থান পাওয়ার সংবাদ এসেছিল। তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, দিদি তার উত্তরে কি কি লিখেছেন? তারই উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকলেম বল্লেম বটে, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছিল, ওঁর যেন এখান থেকে যেতেই তত ইচ্ছে নেই। এ অসম্ভবও নয়। কেন না, সগুনাকে ভাবী ভ্রাতৃবধূ ব'লে এখন তাঁর ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক! তাকে এই রকম

অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে যেতে তাঁর বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ের সংস্কারে বোধ হয় বাধ্‌ছিল। সগুণা যে এই তিন চার বৎসর অন্যত্রে পরের অভিভাবকতায় বিদ্যাশিক্ষা ক'রে এসেছেন, এখনও তিনি যে স্বচ্ছন্দেই নিজের ভার নিজে নিয়ে থাকতে পারেন, সে উনি কিছুতেই মনে রাখতে পারছিলেন না। কোন উপায় পেলে উনি বোধ হয় এখনই এখানে থেকে যেতেন, কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে।

৩০শে ডিসেম্বর।—হরেন্দ্রর চিঠি এলো। দিদিকেই লিখেছে। তাঁর নানা কথার উত্তর দিয়ে—আমি কেমন আছি, সেজন্য বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে শেষে সগুণার বিষয়ে আলোচনা করেছে। লিখেছে—'সগুণা এখন অধীর না হ'লেই ভাল হ'ত! সে নীরেনকে চেনে না, তাই এই ভুলটা করতে পেরেছে। তার বাবা যা-ই বলুন, সগুণা চুপচাপ থাকলেই হ'ত। যাক্, যা হবার, হয়েছে, এখনও সে যাতে বাপের কাছে ফিরে আসে, সেই চেষ্টা আপনিও করুন। এ বিষয়ে তাকে আমারও অনুরোধ জানাবেন। আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকলাম, তার বাড়ী ফেরার খবর পেলে সুস্থ হব। সে যত দিন বাড়ী না ফেরে, আপনারা সর্ব্বদা তার তত্ত্ব নেবেন ও আমায়ও জানাবেন। নীরেন আমাদের ওপোর অনুগ্রহ ক'রে যত দিন ওখানে থাকবে, তত দিনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।" ইত্যাদি।

'দিদি' পত্রখানা সগুণাকে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন; কিন্তু আমার যে একটু বাধা লাগ্‌ছে দু'একটা কথার জন্য। কিন্তু

বারণ করারও পথ তো নেই! নীরেনকে তুমিও চেনোনি হরেন,—মিথ্যে এ সব লিখেছ!

৩১শে ডিসেম্বর।—দিদিকে আজ স্পষ্টই বল্‌লাম, নিজের প্রশংসা-পত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সগুণার কাছে যেতে পার্‌ব না। তিনি আমার চাকরকে নিয়ে টাঙ্গায় চ'ড়ে সেখানে যান। যে দেশে যেমন, সেখানে তেমন ভাবে স্বচ্ছন্দেই চলতে পারা উচিত। আমায় একেবারে অস্বীকার দেখে তিনি অগত্যা তাই-ই কর্‌লেন।

দু'দিন কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি, দিদিকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে সময়টা কাটিয়ে এলাম। তাঁর আমাশার অসুখ আছে, মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এখনও দেখা দিয়েছে, আর তাই নিয়ে কষ্টও পাচ্ছেন দেখ্‌লাম। আমার যাবার কথা উঠ্‌তেই তিনি ঠিক সেই দিনের মত এমন ক'রে উঠলেন যে, সে কথা আর তাঁর সাম্‌নে তুলবই না ভাবলাম। যে দিন যাব, নিঃশব্দেই পালাতে হবে। কিন্তু দু'মাস যে হ'তে চল্‌লো—আর কত দিন এমন ক'রে ব'সে থাক্‌ব এখানে?—এই ডায়েরীরই আরম্ভের দিকে—আর তার মাঝের দিকে চাইলেও একটা এমন হাসি ভেতরটাকে ভরিয়ে তোলে! কি ব্যথা নিয়ে তখন এত ক'রে ফেনিয়ে গেছি। আজকার কথা বল্‌তে যে একটা ভাষাও নেই!—সব যে একেবারে বোবা হ'য়ে গেছে আমার! চিন্তাহীন—বাক্যহীন—স্তব্ধ জড় আমি। ঘৃণা—ঘৃণা! এরই স্মৃতিমাত্র আমার সম্বল!

দিদি ফিরে এলেন। তাঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে একটু অবাক্ হলাম। বুঝ্‌লাম, নিশ্চয় তিনি কোন আঘাত পেয়েছেন! আমায় প্রথমেই বল্‌লেন—"কবে যাবার দিন ঠিক্ কর্‌ছ, নীরেন ?"

"পরশু।"

"বেশ, তাই চল!" তার পরে একটু থেমে যেন নিজ মনেই বল্‌লেন, "এই যে বিষম স্বাধীন মেয়েটি এই তোমাদের সগুণা, এর কপালে কষ্ট আছে শেষে—দেখে নিও! জগতের সকলেরই যেন স্বার্থ নিয়েই কারবার—এমনি যেন তার ধারণাটা!"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, "থাক্ না দিদি ওঁদের কথা—"

"না, থাকবে না, তোমায় তার কথা আজ একটু শুন্‌তে হবে। তোমায়ও চিনিয়ে দেব একটু মেয়েটিকে!"

কি যেন বলতে গিয়ে সাম্‌লে নিলেন তিনি। তার পরে একটু শান্তভাবে বল্লেন—"জান নীরেন, হরেন যে তাকে উদ্দেশ ক'রে ঐ কথাগুলো লিখেছে, সেগুলো প'ড়েও সে বিষম চ'টে গেছে! বল্লে, 'আপনার ভাইকে নিশ্চিন্ত হ'তে বল্‌বেন। আমার জন্য আপনাকে এখানে ব'সে থাকতেও হবে না! আমার জন্য না ভেবে আপনার ভাই নিজের দিকেই যেন সে মনোযোগটি দেন।' আমি তোমায় এখনও বল্‌ছি নীরেন—এ মেয়েটিকে এখনও কেউ আমরা চিনিনি।"

আমি মিনতির স্বরে বল্লাম, "তা হ'তে পারে, দিদি, এই বেলা আমাদের—"

দিদি সে কথায় কর্ণপাতও না ক'রে নিজের মনের গুপ্ত ক্রোধে আবার নিজে যেন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে গোঁ গোঁ ক'রে বল্‌লেন, "সব চেয়ে অসহ্য তার!—বল্‌লামও যে, নীরেন মাত্র আমাদের উপকারী, এইটিই মনে ভেবো না; সে আমার ভাই! নাঃ, আর না, চল, আমরা চ'লে যাই, নীরেন!"

চোখ বুজে বল্‌লাম, "তাই চলুন।" বুঝ্‌তে পারছিলাম, দিদি কি জন্য এত বেশী রেগেছেন। তাঁর এই ভাইটির ওপোরও বিরক্তি, ঘৃণা আর স্বার্থপরতার আরোপই নিশ্চয় তাঁকে এত বিচলিত করেছে।

২রা জানুয়ারী।—এবার আর সে যাওয়া নয়—যা এতদিন মনে মনে কল্পনা ক'রেই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি। "এবার চলিনু তবে, সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" এমনই কতই ছন্দ সে বেদনাকে ঘিরে ঘিরে উচ্ছল জল-কল্লোলের মতই বেজেছে। কিন্তু আজ? কোন্ কথা, কোন্ ব্যথা আজ এ'কে ভাষা দিতে পারে বা অনুভবে আন্‌তে পারে? রাত্রি শেষ হ'য়ে এসেছে, আর ঘণ্টা কতকের পরেই এই দাহকারী আবেষ্টনের দূরে গিয়ে পড়্‌ব! যে দেশ একদিন আমার স্বর্গতুল্য মনে হয়েছিল, আজ সে যেন আমার জতুগৃহস্বরূপ। এর বাতাসেও যেন দাহ্য পদার্থের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে। যতক্ষণ যত দিন আমি এখানে থাক্‌ব, তত দিন ততক্ষণ সেই গভীর ঘৃণার বেষ্টন হ'তে তো নিজেকে দূরে সরাতে পার্‌ব না! সে জান্‌বে, সেই গূঢ়

উদ্দেশ্যেই আমি এখনও এ দেশে ব'সে আছি, এখনও সেই আশাতেই দিন কাটাচ্ছি। যে দিন আমি চ'লে যাবার খবর সগুণার কানে যাবে, সে সেদিনও ঘৃণার হাসি হেসে ভাববে 'এইবারে নীচ স্বার্থপরটা হতাশ হ'য়ে ফিরে গিয়েছে!' হোক্, তবুও সে স্বস্তি বোধ করবে ত'। শান্তি পাবে ত মনে মনে। চাই কি, দিন কতক পরে বাপের কাছেও ফিরে আসতে পারে।

ওরে চল্ চল্, আগুন আগুন; সব মুছে গেছে, রয়েছে কেবল বিপুল "দহন দাহের" শেষ চিহ্ন গভীর ক্ষত, আর তার জ্বালা! ঘৃণা—ঘৃণা—নীচ স্বার্থপর! "মোট ঘাট" সব বাঁধা হ'য়ে গেছে, বয়েল্ গাড়ীতে সে সব বোঝাই দিয়ে সজল-লোচন চাপরাসীটা 'বুক্' করতে অনেকটা আগেই রওনা হ'য়ে গেছে। ঝি চাকর ক'টা কেঁদে আকুল। দিদিকে একটু তাগিদ দেবার জন্য রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, তিনি আমার রাস্তার খাবার তৈরীর শেষ তখনও ক'রে উঠতে পারেন নি, রোদনপরায়ণ 'মহারাজ'কে তখনও লুচি বেলে দিতে দিতে নিজেও তাদের সঙ্গে চোখের জল মুছছেন। একটা তীক্ষ্ণ হাসিই যেন অন্তরের মধ্য হ'তে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমিও তো চেয়েছিলাম গো যে, চোখের জলে এই দেশকে স্নান করিয়ে এর ধূলোকণাকেও শত চুম্বন ক'রে ভক্ত তীর্থযাত্রীর মত এর পায়ে জীবনের পুঞ্জীভূত সার সামগ্রী শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম সব পুষ্পাঞ্জলির মত দান ক'রে রিক্ততার গৌরবপূর্ণ চিত্তে এখান হ'তে চ'লে যাব! স্বপ্নেও

জানিনি যে, আমার এ পলায়ন দাবানলের কবলমুক্ত অর্দ্ধদগ্ধ বন্যজন্তুর সঙ্গে তুলনীয় হবে।

এইবার এ'কেও—এই আমার বিচিত্র ডায়েরীকেও বন্ধ করি! আর কেন! বেশী সময় তো আর নেই! উঠতে হবে এইবার। যাই, দিদির কতদূর দেখি! তাঁর খাওয়া হয়নি তখনও দেখেছি! এ খাতাটা নিয়ে কি কর্‌ব আর। এখানেই ফেলে দিয়ে যাবার মত ভাগ্য তো নয়, কে কোথায় নিয়ে উপস্থিত কর্‌বে, কি হবে, থাক্! পথেই এর গতি করতে হবে। কি হবে আর এতে?

একটি কাজ কর্‌তে পারলাম না, কাকাকে প্রণাম করতে কিছুতেই সাহসে কুলালো না! কি বল্‌বেন, কি করবেন তিনি? থাক্! যেতে যে হবেই, কেন আর উভয় পক্ষেরই কষ্ট বাড়ানো! কষ্ট কি এতেও নেই? এই যে অকারণ স্নেহশীল আজ কয় মাসের অকৃত্রিম বন্ধু—যিনি আমারই জন্য নিজের একমাত্র সন্তানের উপরও অবিচার করেছেন, তাঁর সেই স্নেহের প্রতিদানে তাঁকে না ব'লে এক রকম লুকিয়েই তাঁর একটু পায়ের ধুলোও না নিয়ে আমি চ'লে যাচ্ছি! আর তিনি? এ খবর যখন তিনি শুন্‌বেন? যাক্, এও আমার এই যাত্রাপথের এক পাথেয়! এ'কেও নিতে হবে কাঁধে তুলে।

* * * * *

চলেছি, কখনও ঘন বন, কখনও মরুর মত ধু-ধূ প্রান্তর, কখনও গিরি-দরী-উপত্যকার মাঝ দিয়ে বেগে ছুটে চলেছি—ঝড়ের মত, হু-হু ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দের সঙ্গেই ভাস্‌তে ভাস্‌তে!

বুঝতে পার্‌ছি না এখনও, এরই মধ্যে কি কি ঘ'টে গেল! এই খাতাটার আর কাজ নেই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখছি, এ'কেই তো খুলে বসেছি আবার এখনও! যা যা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, তাদেরই লিখে রাখতে হবে এই জীবন-খাতায়! কেন তা জানি না, তবু লিখতেই হবে।

একটি একটি ক'রে লিখে লিখে অঙ্ক ক'সে তবে যেমন তার আদি মধ্য অন্ত প্রশ্ন মীমাংসা উত্তর স্থির করতে হয়, তেমনি ক'রে! কিন্তু এ অঙ্কের কি শেষ ফল এখনই নজরে পড়বে? এর কি শেষ হবে এখনই? না গো, এ যে চিরজীবন ধ'রেই ক'সে যেতে হবে।

যাঁর জন্য এই দু'মাস ওখানে বাস, সেই দিদিই আমার সঙ্গে নেই! একা চলেছি! তাঁর হাতের বাঁধা জিনিষপত্র, তাঁর হাতের সাজা পাণ, প্রস্তুত মিষ্টান্ন আমার সঙ্গে চলেছে, কেবল সঙ্গে নেই তিনিই! এইটুকু স্নেহ সম্বল, এইটুকু লাভ নিয়েও আমি এখান থেকে বেরুতে পারলাম না! সব—সব নিঃশেষে সর্ব্বশেষ সামান্য স্নেহ-আশ্রয়টুকুও নিঃশব্দে সেইখানেই দিয়ে আসতে হ'ল। যেখানে আমার এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের জীবনের—যাক্!

টাঙ্গা আন্‌তে চাকরকে হুকুম দিয়ে দিদির খোঁজে গিয়ে দেখি, তিনি ঘরে নেই। চাকরাণীও নেই। 'মহারাজ'কে প্রায় চোখ রাঙিয়েই খবর আদায় কর্‌লাম। দিদি চৌধুরী সাহেবের বাংলায় তাঁকে দেখতে গিয়েছেন। চৌধুরী সাহেবের (সগুণার

বাবার) বাড়ীর দাই আমাদের দাইয়ের বোনঝি,—মাসীকে কাল নাকি বলেছিল যে, সাহেবের অসুখ তো খুব বেশী ! আজ তিন চার দিন থেকে কিছু খায় না, তবু বেটীকেও ডাক্‌বে না, ডাক্তারও দেখাবে না, ছোট কুঠীর সাহেবও তো চ'লে যাচ্চেন, এইবার বুড়ো বেচারা ম'রেই যাবে। এই কথা এখনই শুনে দিদি প্রায় না খেয়েই উঠে প'ড়ে দাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ! নিশ্চয় চৌধুরী সাহেবকেই দেখতে গেছেন ! এখনই আসবেন, সে জন্যে আমার "কুচ্ছু ভাবনা না আসে।"

'মহারাজ' তো বল্‌লেন ভাবনা নেই, কিন্তু আমার যে ভাবনার পাহাড় মাথায় চাপলো ! সত্যি কি তাঁর অসুখ বেশী ? আমি খবর নিইনি বটে, কিন্তু তিনিও তো দেননি। আমার যাবার খবর জেনেই কি তাঁর এই প্রতিশোধ দেবার চেষ্টা ? কিংবা এ আকস্মিক ঘটনা ? খবর তিনি ইচ্ছা ক'রেই যে দেন নি, সে বেশ বোঝা যাচ্ছে ! দাইয়ের মুখে এটা তো দৈবাতের ব্যাপার ! চাই কি, এটুকু খবরে বিচলিত না হ'য়ে আমরা চ'লে যেতেও পারতাম। আমি বোধ হয় এখনও তাই-ই করতাম, কিন্তু দিদি যা করলেন, এর ফল কি হবে, তা যে বুঝতে পারছি না !

টাঙ্গা এলো—সময় ব'য়ে চল্‌লো। আর দেরী কর্‌লে ট্রেণ পাব না বুঝে অগত্যা আমায়ও চলতে হলো—যেখানে যাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রেই আমি পালাচ্ছিলাম, সেইখানে তাঁরই কাছে ! দিদি কি বিভ্রাট বাধালেন এই যাত্রার সময়ে, একটু বিরক্তিই

আস্‌ছিলো যেন ভেবে। মন তখন প্রচণ্ড শুষ্কতায় একেবারে রুক্ষ রসহীন, মমতার লেশও তা'তে ছিল না যে!

গিয়ে যা দেখলাম, স্তম্ভিতই হ'য়ে গেলাম। ইনি এতখানি অসুস্থ হয়েছেন, তবু জানান নি তো! বোধ হয়, স্নেহ-পাত্রের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে ব্যথিত হ'য়েই এমন করেছেন। আমি যে তাঁকে না ব'লেই পালাচ্ছি, তাও হয় ত ইনি জানেন! মনটার তখন এমন অবস্থা যে, তাঁর এই কাণ্ড দেখেও মনে হ'ল, যতই আঘাত এঁকে দিই, তবু এ ভিন্ন আমার গত্যন্তর কোথায়! আমায় যে যেতেই হবে।

দিদির কোলে মাথা রেখে একেবারে অজ্ঞানের মতই তিনি প'ড়ে আছেন, শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, ম্লান! মনে পড়লো, আমাশার অসুখে ইনি কিছুদিন হ'তেই কষ্ট পাচ্চেন; সেটা হয়ত বেশী রকম বেড়ে গেছে! কিন্তু এই জ্ঞানহীন অবস্থা—এ কি দৌর্ব্বল্য, না আরও কিছু? সভয়ে আমি দিদির পানে চাইতেই দিদি মৃদুস্বরে বল্‌লেন—"ভয় নেই, ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছি, সগুণাও এসে পড়লো ব'লে।" বুঝলাম, দিদি এসেই তাঁদের খবর দিয়েছেন। সম্মুখে অজ্ঞান রোগী—তবু আমার মনের মধ্যে আশার একটা দম্‌কা বাতাস ব'য়ে গেল! এই ব্যাপারে বুঝি একটা শুভ সংঘটনই ঘ'টে উঠবে! সগুণাকে তাঁর গৃহে বাপের কোলে প্রতিষ্ঠিতই দেখে যেতে পারব!

নিঃশব্দে দিদির সাহায্য করতে লাগলাম। সে ট্রেণে যাবার ভরসা ছেড়েই দিতে হ'ল। কাকার এই অজ্ঞান ভাবটা একটা

সাময়িক উত্তেজনার ফল ব'লেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল। ডাক্তারও তখনই এসে প'ড়ে আমার মতেরই পোষকতা করলেন। তবে তাঁর দৌর্ব্বল্য ও ব্যারামটা যে বেশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, সেটুকুও জানাতে দেরী করলেন না।

তিন জনের পাশে আর এক জনও এসে তখন দাঁড়িয়েছেন। তিনি সগুণা। নিঃশব্দে দিদি তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে কাকার মুখের সামনে বসতে বললেন—যাতে তাঁর জ্ঞান আসতেই মেয়েকে দেখতে পান! সগুণা তা না গিয়ে দিদির পাশে ব'সে পড়লেন। হাত-পা তখন তাঁর স্পষ্টই কাঁপছিলো, চোখেও জল ঝরছে! দিদি তাকে এক হাতে স্পর্শ ক'রে নিঃশব্দে যেন সান্ত্বনা ও সাহস দিতে চাইলেন।

রোগীর সংবিৎ তখন ফিরেছে। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে দিদির মুখপানে চেয়ে তিনি "মা" ব'লে এমন একটা আর্ত্ত করুণ স্বরে ডেকে উঠলেন—যাতে আমার সেই শুষ্ক নীরস ঈষৎ বিব্রত ব্যস্ত মনের উপরও একটা ধাক্কা এসে পৌঁছুলো। কি করছিলাম আমি! তাঁর কোন খবর না নিয়ে এমন ক'রে চ'লে যাওয়া এ যে ঘোর কৃতঘ্নতারই পরিচায়ক! ভগবান্ যে দিদির পুণ্যে আমায় একটা দারুণ পাপ হ'তেই রক্ষা করলেন, এটুকু বুঝতে দেরী হ'ল না! এ কৃতজ্ঞতাটুকু আমার কাছে তাঁর চেয়ে দিদিরই প্রাপ্য ব'লে মনে হ'ল।

কাকার আর্ত্তস্বরের উত্তরে দিদি তাঁর করুণাসুন্দর মুখ তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের স্নেহসজল দৃষ্টি তাঁর অসহায়

দৃষ্টির উপর স্থাপিত ক'রে ডাকলেন—"কাকা!" দিদির পানে চেয়ে চেয়ে তাঁর চোখের কোণ যেন সজল হ'য়ে উঠলো। অস্ফুটে আবার যেন কি বল্‌তে চাইলেন। সে বার আর স্বর না ফুটায় ডাক্তার ষ্টিমুল্যাণ্ট পথ্য তাঁর মুখের গোড়ায় ধরতেই তিনি হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরে হাতের ধাক্কায় সেটাকে সরিয়ে দিলেন। দিদির পানেও চেয়ে সহসা তেমনই অস্বাভাবিক সজোর কণ্ঠে বললেন, "নীরেন চ'লে গেল তো গেল? বেশ! তবে তুমি এখনও কেন রয়েছ? যাও, তুমিও যাও, কাউকে চাই না আমি! এমনি ক'রেই আমি—যাও, তুমিই কেন এসেছ আমায় দেখতে, কে তুমি আমার?"

তাঁর জোর গলায় ও ভাবের এই পরিবর্ত্তনে সন্ত্রস্ত হ'য়ে সকলে তাঁর নিকটস্থ হ'তেই দেখা গেল, আবার তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন। সে ক্ষীণ শরীরে এতখানি উত্তেজনা ধারণ করার শক্তি কোথায়! ডাক্তারের সঙ্গে দিদি আর সগুণা তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন, আমি কেবল জড়ের মত দূরে স'রে রইলাম। নিজের ইতি-কর্ত্তব্যতাও এরই মধ্যে ভেবে নিচ্ছিলাম! যেতে যখন আমায় হবেই, তখন কেন আর বারে বারে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। তাঁর এই ধারণাই বজায় রেখে আমি ধীরে ধীরে স'রে যাই; কেবল তাঁকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখে যেতে চাই মাত্র।

শীঘ্রই আবার তিনি সুস্থতা পেলেন, আর তারই মধ্যে ইঙ্গিতে আমি দিদিকে আমার ইচ্ছাটা জানিয়ে দিলাম। দিদিও

আমার অবস্থাটা ভালই বুঝছিলেন নিশ্চয়, নইলে একটুখানি মাত্র ভেবে নিয়ে অনেকখানি ক্লিষ্টতার সঙ্গেও আমার পানে সম্মতির দৃষ্টিতে চেয়ে তার পরেই একটু যেন উদ্বিগ্ন প্রশ্নের সঙ্গেই আমার পানে দৃষ্টি ফিরালেন। তিনি নিজে কি করবেন, এই সমস্যাই বোধ হয় সে দৃষ্টির অর্থ ছিল! আমায় কিন্তু ভাব্‌তে হ'ল না—উত্তরও দিতে হ'ল না! ভগবান্‌ই যেন তখনই সে মীমাংসাও ক'রে নিলেন। কাকা আবার দিদির পানে চেয়ে চেয়ে মৃদুস্বরে যেন নিজ মনেই বল্‌লেন, "কিন্তু তুমি তো যেতে পারনি! কে তুমি আমার! তোমায় আমি অপমানই বরং করেছি, দুঃখ দিয়েছি—তবু তা'রা যা পারলে, তুমি তো তা পারলে না! কি ক'রে তা পারবে! তোমায় যে আমি চিনেছি—তার অসুখের সময়েই! তুমি যে মায়ের জাত মা, আমাদের ঘরের অশিক্ষিত মেয়ে যে তুমি! তাই মরণাপন্নকে ফেলে যেতে পারলে না। আর জন্মে তুমিই আমার মেয়ে—না না—মা—মা ছিলে, মা বুঝি, তাই—"

ব্যথিতের দুই চক্ষু দিয়ে এইবার জলের ধারা নাম্‌লো—আর সেই সঙ্গে সব চোখগুলোই ভিজে উঠলো। দিদি স্নিগ্ধ হস্তে রোগীর মস্তক স্পর্শ ক'রে "এইটুকু খান্ তো, কাকা" ব'লে মুখের গোড়ায় পথ্য ধরতেই "দাও মা" ব'লে নিরাপত্তিতে তিনি তখন সেটুকু পান করলেন! তাঁর পাণ্ডুশীর্ণ মুখে একটা আশ্রয়-প্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা যেন তখনই ফুটে উঠলো। দিদি তখন আস্তে আস্তে তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে বল্‌লেন "আপনার

অসুখ শুনে সগুণা যে চ'লে এসেছে কাকা, আমার সঙ্গে সেও যে আপনার সেবা করছে, দেখতে পাচ্চেন না ?" কাকা এ সংবাদে আবার কি রকম না জানি হ'য়ে পড়েন, সেই আশঙ্কায় আমি প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। সগুণা দিদির পাশে ব'সে না জানি তখন কি ভাবছিলেন! কিন্তু কাকা কিছুই করলেন না, বা বল্লেন না! স্থিরভাবেই এ সংবাদ শুনে গেলেন, একটু পরে বল্‌লেন—"আমি ঘুমুব।"

তখনই আবার শঙ্কিত নেত্রে দিদির পানে চেয়ে বল্‌লেন, "তুমি উঠে যেও না যেন; ব'সে থাকবে ত আমার কাছে?" দিদি মাথা নেড়ে স্বীকার করায় তখন তিনি যেন নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদ্‌লেন।

নিঃশব্দপদে আমি বাইরে চ'লে এলাম। বাপের এই উদাসীনতা না জানি সগুণার মনে কতখানি আঘাত করলে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, এ ব্যাপারটা যেন অত্যন্তই স্বাভাবিক! দুই পক্ষেরই এতে অনেকখানি বাঁচোয়া হ'য়ে গেল—অনেকগুলো পরের চোখের সাম্‌নে থেকে! এই-ই ভাল হ'ল!

ডাক্তার ও সগুণা বাইরে বেরিয়ে এলেন। বুঝলাম, ডাক্তারের আহ্বানেই সগুণা তাঁর সঙ্গে এসেছেন। রোগী যে দুশ্চিকিৎস্য রোগে কিছুদিন হ'তে ঔষধ-পথ্যের সাহায্য না নিয়ে নিজেকে বেশ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ই এনে ফেলেছেন, সব চেয়ে তাঁর দুর্ব্বলতাই যে চিন্তার বিষয় হয়েছে, এই মতগুলি

ব্যক্ত ক'রে ডাক্তার সগুণা ও আমাকে রোগীর সম্বন্ধে খুব যত্ন ও মনোযোগ নেবার ইঙ্গিত করলেন। সগুণা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কেবল শুনেই যেতে লাগলেন। আমি ডাক্তারকে ভরসা দিলাম "দিদি যখন ভার নিয়েছেন, তখন শুশ্রূষার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন, আর ইনিও আছেন,—দুজনে—"

"তাই নাকি?" ডাক্তার উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—"আপনার দিদিকে রোগীর কাছে রাখছেন তা হ'লে? তা হ'লে তো আর ভাবনাই নেই! আপনার ব্যারামের সময় ওঁর যা যত্ন করবার ক্ষমতা দেখেছি, বড় বড় নার্সরা তেমন পারেন না। মশায়, আপনাকে কি এবার বাঁচাতে পারা যেত, যদি না—"

"এঁর কি কি পথ্য আপনি ব্যবস্থা করলেন—কবার কোন্ কোন্ সময়ে" ইত্যাদি প্রশ্নে আমি সত্বরে এই ডাক্তার-পুঙ্গবের বাক্য-স্রোতকে অন্যদিকে চালিয়ে দিলাম। এই সরকারী ডাক্তারটিই "সাহেব" ডাক্তারের সহকারী থেকে আমার সেই অসুখের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করেছিলেন। সগুণার সাম্‌নে সেই অসুখের উল্লেখ আমাকে মাটীর সঙ্গেই যেন মিশিয়ে দিতে চাইলে। ডাক্তার আবার সগুণাকে পিতার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়ে ও ও-বেলা এসে যে তিনি দিদির সঙ্গে রোগীর চিকিৎসার সম্বন্ধেও 'কন্সল্ট' করবেন, দিদি যে এখনকার হেটোমেঠো ডাক্তারের চেয়ে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, সে কথা বার বার ক'রে জানিয়ে বিদায় নিলে আমিও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু ইতস্ততঃ ক'রে সগুণাদেবীকেই বল্লাম, "আপনি

যদি কাকার কাছে ব'সে দিদিকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন তো বড় ভাল হয়।"

আর যে আমি সেখানে এক মুহূর্ত্তও কাটাতে পারছিলাম না। সগুণা একটু এগিয়ে গেলেন, তার পরেই ফিরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন, (কতদিন কতকাল পরে তাঁর আমার সঙ্গে এই কথাটুকুও বলা!) "তিনি উঠে এলে বাবা হয় ত জেগে উঠবেন! আপনিই তাঁর কাছে গেলে ভাল হ'ত।"

কিন্তু যদি কাকা না ঘুমিয়ে থাকেন—যদি ধরা পড়ি, তুই এক মুহূর্ত্ত ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবতেই দেখি, দিদি নিজেই বেরিয়ে আস্‌ছেন। আমাদের তাঁর দিকে একসঙ্গে চাইতে দেখেই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, "বেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

আমি এগিয়ে তাঁর পায়েব ধূলা নিতেই তিনি একটু শঙ্কিতমুখে বল্‌লেন—"চল্‌লে?"

"হ্যা দিদি।"

"কিন্তু আমার কথা নীরেন,—আমি কি করব?"

"এখনও কি তা জিজ্ঞাসা করবেন, দিদি? আমার আগে আপনিই তো তা দেখতে পেয়েছেন। আসি, দিদি।" আবার আমি তাঁর পায়ের কাছে নত হ'তেই তিনি ঠিক মায়ের মতই অধীর আবেগে আমার মাথার উপরে হাত রাখলেন,—যেন মাথাটিকে কোলেই টেনে নেবেন, কিন্তু চিরসংযতহৃদয়া বিধবা তখনই যেন নিজেকে সামলে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন "এখনই—এখনই, নীরেন? ট্রেণ তো নেই এখন

আর ?" "আছে খানিক পরে একটা প্যাসেঞ্জার।" ব'লে নিঃশব্দে আমি সগুণার দিকে মাথাটা নীচু করতেই আবারও আমার উদ্দেশে তাঁর একটু ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"এ সময়ে আপনিও থাকলে বাবা হয় ত সুখী হ'তেন,—আমাদেরও অনেকটা ভরসা থাকতো।"

এই যথেষ্ট—আর না, এর চেয়ে আর লোভ নয়! আমার এই-ই যে আশাতীত ধারণাতীত লাভ! মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পরলোকের একটু আশ্বাস-বাণীর মত কে বিধান করলেন এটুকু আজ আমার জন্য ? প্রণাম তাঁকে—শত শত প্রণাম।

নিজে উত্তর দেবার সামর্থ্য হ'ল না—চাইলাম আমার দিদির পানে। মুহূর্ত্তে তিনিও নিজের বিচলিত ভাব সামলে নিয়ে গম্ভীরমুখে সগুণাকে আমার হ'য়ে উত্তর দিলেন, "না—নীরেনকে যেতেই হবে। এসো তবে, ভাই।"

নীরবে খানিক চ'লে আস্তে আস্তে একবার পরম ও চরম দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় পৌঁছে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, দিদি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছেন, আর তাঁর চোখের জল ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরণার মতই ঝ'রে পড়ছে। জগতে গর্ভধারিণী মা ছাড়া আর তাঁরই মত স্নেহশীলা ভগিনী ছাড়া পরের জন্য এমন ক'রে কেউ যে কাঁদতে পারে, এ যে আর কখনও দেখিনি! অন্য কেউই কি দেখেছে ? সন্দেহ হয়।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সগুণা শুষ্কমুখে কেমন যেন স্তব্ধভাবে তাঁরই দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে চেয়ে আছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই মাটীর উপরে একবার বুক দিয়ে শুয়ে সে মাটীকে সাষ্টাঙ্গে আমার শেষ অভিবাদন জানিয়ে চ'লে আসতে ইচ্ছে হ'ল—পারলাম না, লজ্জায় বাধ্‌লো। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তেমনই চ'লেই এলাম।

ভেবেছিলাম, দেশে ফিরে আর আমায় এ খাতায় হস্তার্পণ করতে হবে না, কিন্তু আজ এক মাস পরে আবার যেন নিজের অজ্ঞাতেই এ'কে নিয়ে বসেছি। কিন্তু কি লিখতে? কি আছে আর আমার লিখবার, বল্‌বার বা ভাববার? স্নেহময় আত্মীয়স্বজন আমার ছয়-মাসব্যাপী প্রবাসে কতখানি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, শেষে কি আশায় তাঁরা আশান্বিত হ'য়ে একটা শুভ দিনের অপেক্ষায় পথ চেয়েছিলেন, পরে আমায় একা ফির্‌তে দেখে কতখানি নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন, এবং এখন তাঁরা সকলে একটি মনোমত পাত্রীর অন্বেষণে কি রকম ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছেন, দিনের মধ্যে বহুবার আমায় এ কথাগুলা নিঃশব্দে শুনে যেতে হ'ত। কিন্তু এই নিঃশব্দ নিস্তব্ধতায় একটা উপকার হ'ল। তাঁরা ক্রমে আবার হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

দিদির চিঠি পেয়েছি। কাকা অনেকটা ভাল আছেন বটে, কিন্তু রোগটা কুটিল রোগ, বিশেষ তাঁর বয়স হয়েছে, তাই যেন একেবারে সার্‌তে চাচ্ছে না। হয় ত তা সার্‌বেও না। যথেষ্ট নিয়মেই তাঁকে সর্ব্বদা রাখতে হচ্ছে। দিদি দেশে

ফিরবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সগুণা আর তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে চাচ্ছে না, বিশেষ তার বাপের দরকারেই এখন তাঁকে ধ'রে রাখতে সগুণা ব্যগ্র। রোগে ভুগে কাকা না কি এখন ভারি খিট্‌খিটে হয়েছেন। কেউ একটা অপছন্দের কথা বল্‌লে তিনি তিন দিন আর তার সঙ্গে কথা কন না। দিদি আর সগুণা দু'জনের ওপরে পালাক্রমে রাগটা পড়ায় তবু এক রকমে চ'লে যাচ্ছে, একা হ'লে সগুণা নিতান্তই মারা যাবে। বিশেষ দিদির আস্‌বার ইচ্ছা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পেলেই কাকা আরও অস্থির হ'য়ে উঠেন। সেই উদ্বেগটা তাঁর রুগ্ন শরীর-মনের উপর এমন কাজ করে যে, সত্যই তিনি যেন তার পরে আরও বেশী রকম পীড়িত হ'য়ে পড়েন। কাজেই, দিদির আর আমার নামটি পর্য্যন্ত প্রায় মুখে আনার উপায় নেই!

এ খবরে আমার এমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধির কথা নহে, বরং দিদিকে দিয়ে তাঁদের ভাঙা ঘর যে আবার জোড়া লেগেছে, এ'তে আমার সুখী হবারই কথা! কিন্তু হায় রে মানুষের 'আমি'। এত বড় বুঝি জগতে আর কিছুই নেই! এ খবরগুলো আমায় যে এক এক সময়ে কত ভাবেই পীড়িত করত, তার তথ্যানুসন্ধানে মাঝে মাঝে আমিই অবাক্ হ'য়ে উঠতাম! কখনও মনে হ'ত, এই একটু লাভ আমার, তাও বিধাতার প্রাণে সইল না। সেটিকেও ছেড়ে দিয়ে আস্‌তে হ'ল! দিদি দেশে থাক্‌লে বুঝি তাঁর কোলের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে দিতে পার্‌লেও আমার এর চেয়ে ভালভাবে গোটাকতক দিনও

কাটত। কিন্তু হরেন্দ্রর মনোগত ইচ্ছা ছিল, দিদিকে ওঁদেরই কাছে রাখে, বাধ্য হ'য়েই সে আমার হাতে তাঁকে দিয়ে যায় বৈ ত নয়। যাঁর প্রতিকূলতায় সে ইচ্ছায় তার বাধা পড়েছিল, তিনিই আবার দিদিকে কাছে রাখতে এখন ব্যগ্র। দিদিরও ভাবী ভ্রাতৃজায়া ছাড়া জগতে আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই, সুতরাং তিনি প্রথমটা যতই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করুন, ক্রমশঃ তাদের সঙ্গই তাঁর অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে। এই অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবটাই বা কিসের জন্য? এই দু'দিনের পরিচিত একান্ত অপরিচিত ভাইটির কথা মনে ক'রেই ত? কিন্তু সে কথা আর কত দিনই তিনি মনে রাখতে পার্‌বেন? রেখেই বা লাভ কি? স্রোতের-মুখে-ভেসে-যাওয়া তৃণগুচ্ছের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কে স্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? অভিভাবক ভাইটির ঈপ্সিত স্থানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পেলে কে আর কোন্ একটা দুঃখীর কথা ক'দিন মনে রাখতে পারে! তাকে ভাই-ই বলি আর যাই-ই বলি!

অভাব, দুঃখ, প্রলাপ সবই ক্রমান্বয়ে এত রকম রকম মনের মধ্যে খেলে যেতো—যাতে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হ'য়ে পড়তাম! কিন্তু নদীর স্রোতের গতি কে-ই বা রোধ কর্‌তে পারে। "মন্যোদুর্নিগ্রহম্ চলম্"—এই বায়ুর চেয়েও চল [illegible]টিকে নিগ্রহই বা কে কর্‌বে?

১লা এপ্রেল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেমন বিচিত্র ভাবেই কেটে যাচ্ছে। সম্মুখে সেই দিন আস্‌ছে, যে

সময়ে আমি আমার জীবনের এই বিচিত্র তত্ত্ব এই কাঁটার মুকুট মাথায় পরবার জন্য "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" হ'য়ে ছুটে চ'লে গিয়েছিলাম! সম্মুখে আগত এই গ্রীষ্মের পরই বর্ষার আরম্ভেই ত আমার সে যাত্রা। গ্রীষ্মের এ দাবদাহকে ত ভয় লাগছে না, বরং দেহে মনে বাহিরের কোন্ একটা যন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভব কর্‌বার জন্যই সময়ে সময়ে ব্যগ্র হ'য়ে উঠছি। মনে হয়, তাতে যেন একটু ভাল থাক্‌ব, একটু অন্যমনস্ক হব। পশ্চিমের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকরা যেমন ব্যথাদায়ক কোন পীড়ার প্রতিষেধকরূপে দ্বিগুণ যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, ঠিক্ তেম্‌নি! না, না—সেই বর্ষা—সেই শরৎকে আমি এবারে সইতে পার্‌ব না। কিন্তু কোথায় যাব? বর্ষা-শরতের হাত এড়াতে আমাদের দেশের মধ্যে এমন কোন্ স্থান পাব? তবে কি দেশ ছেড়েই চ'লে যাব? হরেন্দ্রর কাছে যাব, য়ুরোপে যাব?

২রা এপ্রেল। কাল কি এই জন্যই হরেন্দ্রর কথা মনে হয়েছিল? তার কাছেই যেতে হঠাৎ ঝোঁক এসেছিল? তার পরেই হঠাৎ তার চিঠি। অনেক দিন পরে! ইদানীং আমি দেশে চ'লে আসার পর এই কয় মাসে তার একখানি ভিন্ন বেশী চিঠি পাইনি!

কি সংবাদই সে দিয়েছে। এখনও ছ'মাস হয়নি, সে সেখানে গিয়েছে, এর মধ্যেই বন্ধুবেশী জুয়াচোরের হাতে প'ড়ে তার সর্ব্বস্ব গেছে! এখন মাত্র চ'লে আসার মত আন্দাজ টাকা

তার হাতে আছে। আমাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেছে, সে কি করবে? সমস্ত উচ্চ আশায় ত জলাঞ্জলি পড়লই, ঘরে ফিরে এসে দেশে যা যৎসামান্য সম্পত্তি আছে, তাই দেখে শুনে তাকে দীনভাবেই জীবন কাটাতে হবে, কেননা, এ ভিন্ন আর তার গত্যন্তর নেই। সগুণার বাবার কাছেও আর সে মুখ দেখাতে পারবে না! যে কাকা তার বিলাতের খরচ সব একেবারে দিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছেও আর সে হাত পাততে পারবে না। তিনি তার এ কথা বিশ্বাসই করবেন না। তার এমন বন্ধুও কেউ নেই, যার কাছে সে হাজার কতক টাকা ধার চাইবে! দিদিকে জানালে তিনি এখনই হয় ত দেশের যা কিছু সম্পত্তি আছে, বিক্রি ক'রে তাকে পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু বিধবা বোন্‌কে গাছতলায় বসিয়ে পরাশ্রয়ে রেখে এমন উন্নতি সে ইচ্ছে করে না। সে ফিরেই আস্‌বে। তবে মাসখানেক এখনও তাকে নানা রকমে বাধ্য হ'য়েই থাকৃতে হচ্ছে। ফিরে এসে সে আমার কাছে প্রথমে উঠে সব কাহিনী অকপটে বল্‌বে। পত্রে সব ঘটনা বোঝানো যাবে না ব'লেই সে মিথ্যা উদ্যম থেকে নিরস্ত হ'ল। ইত্যাদি—

এই তুচ্ছ ব্যাপারে সে তার অত বড় ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত হবে! টাকা থাকলেই কি কামনার ধন এ জগতে মেলে? কত ত কুবের আছে, সকলে কি পেয়েছে তা? এই ত টাকার মূল্য! যা ভার ভারবাহী গাধার মতই ক'রে তুলেছে আমায়, তা নিয়ে আমিই বা কি করব? অথচ এরই জন্যে একটা

আমারই মত প্রাণ নিষ্ফল হবে? না, এ কখনই ন্যায়বিচার নয়! এই যে আমরা পৃথিবীর কতকগুলা জড়-কণা এক যায়গায় স্তূপীকৃত ক'রে তুলি, যার নাম ধন, এর ওপোর কেবলমাত্র তারই বংশানুক্রমে অধিকার—যে এ'কে এক স্থানে সংগ্রহ করেছে। আর তার পাশে তেমনই কতকগুলা মানুষ এই জিনিষটা জোগাড় করতে না পেরে প্রতিপদে জীবনের সর্ব্বসাফল্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, এমন কি, শেষে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? কেন? কে এ নিয়ম বা'র ক'রেছে? এ যে ঘোর অনিয়ম! সমস্ত জীবজগতের দিকে চেয়ে দেখলেই বুঝা যায়, এ নিয়ম মানুষের নিজে গড়া! এ পৃথিবীর—সবই যাঁর, এ তাঁর নিজের নিয়ম কখনই নয়। তিনি আমার মনের ভিতরে বলছেন, তোর কাছে এই যে আমার ভাণ্ডার গচ্ছিত রয়েছে, এ'তে তোরও যেমন অধিকার, হরেন্দ্ররও তেমনই, সকলেরই এ'তে ভাগ আছে।

আগে হরেন্দ্রকে চিঠি লিখলাম একটু, বেশী কথা কইতে পারলাম না। মানুষের কতটুকু সামর্থ্য? তাই তাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতে গিয়ে বেশী কথা আর জোগাল না! লিখলাম— "তোমার কিন্তু একটা সুযোগ এসেছে এই ব্যাপারে! সগুণার বাবা তোমার ওপোরে যে রেগে আছেন, তুমি নিষ্ফল হ'য়ে ফিরলে এখনই তাঁর সে রাগ নিশ্চয় প'ড়ে যায়। আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ওপোরে জোর পেয়ে তিনি বরং খুসীই হ'য়ে যাবেন। তুমি যদি ফিরে এস—এখনই সগুণাকে লাভ কর! তোমার যে

বিদ্যাবুদ্ধি আছে, দেশেই তুমি এক জন গণ্য-মান্য লোক হ'তে পারবে! নাই বা পাশ করলে, ফিরেই এস।"—এইটুকু লিখতে উঃ, ঘেমে উঠেছি, বুকের মধ্যের হাওয়া ধড়ফড়্ ক'রে উঠে সমস্ত যন্ত্রগুলোকে কি বিষম জোরে চালিয়ে তুলেছে। সেই যে ছবি দেখেছিলাম—নায়েগ্রা প্রপাতের ওপোর দড়িতে পা রেখে রেখে পার হওয়া,—ঠিক্ তেমনই। কিন্তু যাক্, তবু তীরে এসে পৌছেছি! ভগবান্ ধন্য।—লিখে ত ফেলেছি—তার পর এ ধাক্কা সাম্লাতে যাই হোক্!

নিজে টাকা পাঠাচ্ছি, এ কথা বল্তে পারবো না। ভারি লজ্জা করছে। সে যেন একটা মস্ত অহঙ্কার দেখানো! বরং একটু মজাই করা যাক্ তার সঙ্গে। কে টাকা পাঠাল ব'লে একটু ধাঁধা লাগুক হরেনের। চিঠির শেষেও একটু ছল ক'রে লিখে দিলাম,"টাকার চেষ্টা করছি, দেখ্ছি যদি কোন বন্ধু পাওয়া যায় এ বিষয়ে!" ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কেই অর্ডার যাবে, হরেন্দ্র লণ্ডন থেকেই সে টাকা পাবে সেখানের ব্যাঙ্কের মারফতে, সেখানে আমার নামের ত কোন দরকার নেই। সে এখানের ব্যাঙ্কের সঙ্গেই মিটে যাবে। আমার চিঠিতে পাশ দিয়ে কাজ নেই, চ'লে এস এই রকম পরামর্শই আছে,—এতে সে হয় ত ভেবে নিতে পারে, আর কেউই টাকা পাঠিয়েছে। নিতান্ত নির্বোধের মতই কথা বল্ছি! সে যে মাত্র আমাকেই খবরটা দিয়েছে, তার দিদিকে বা সগুণাকে পর্য্যন্ত জানায়নি! এ ক্ষেত্রে আমায় ভিন্ন কা'কে আসামী করবে?—তবু দেখা যাক্,—এ বেশ

একটা মজার খেলা, একটু খেলাই যাক্ না তার সঙ্গে। শুনেছি, গাজনের সন্ন্যাসীরা এমনই ক'রে ধারালো অস্ত্র নিয়ে, তীক্ষ্ণ কাঁটার স্তূপ নিয়ে, ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দে জলন্ত আগুনের পুঞ্জ নিয়ে এমনই ক'রে খেলা করে, উন্মাদ আবেগে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে! আমারও এ ত তেমনই খেলা! ঠিক্ তেমনই চক্‌চকে চক্‌মকে তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের উপর পা দিয়ে দিয়ে তীব্র-স্রোতা নদীর সেতু পার হওয়া, তেমনই কাঁটার বনে গড়াগড়ি—তেমনই বেড়া আগুনের মধ্যে লাফালাফি। ঠিক্—সব ঠিক! আমি ত গাজনেরই সন্ন্যাসী। আমার চির-দিনের কবির কতকগুলো কি সব কথা এমন ভিড় ক'রে অথচ অস্পষ্টভাবে মাথার মধ্যে আস্‌ছে একসঙ্গে যে, কাউকেই ভাল ক'রে ধর্‌তে পার্‌ছি না!—এই গাজনেরই কথা—এই কাঁটা বন—এই আগুনেরই কথা। কিন্তু থাক্—যা প্রকাশেরই নয়, তাকে কেন আর কথার মালা গেঁথে বিড়ম্বনা দেওয়া

১৪ই এপ্রেল। হরেনের টেলিগ্রাম এলো—সে ত দিশা-হারা হ'য়ে পড়েছে। "নামহীন কে আমায় ৫ হাজার টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের মারফতে!—এ তুমি—নিশ্চয়ই তুমি!" হাসি একটু! আবার সেই গাজনের কথাই মনে পড়ছে; সম্মুখেই এই যে নীললোহিতের পূজার গাজনপর্ব্ব। পাড়াগাঁয়ে এত দিন কোন্ দিন তার ঢাক বেজে উঠেছে। শুনেছি, মড়ার মাথাকে সিঁদুরে কাজলে ভূষিত ক'রে তারা নাচায়—আর নিজেরায় নাচে—হাসে—হাঃ হাঃ হাঃ! আর ঢাকের

বাজনার তালে তালে সেই অস্থিসার শবের মুখও নাকি কেমন কেমন দেখায়! হিঃ হিঃ হিঃ! সেই প্রচণ্ড হাস্য-স্রোতের 'বোলে'র মধ্যে সেও যেন তীক্ষ্ণ হাসি হাসে; বাজনার শব্দে তারই তীব্র হাস্যধ্বনি বাজে ড্যাং ড্যাং খিঃ,—ড্যা ড্যাং খিঃ! তেমনই হাসি আমারও চারিদিকে যেন বাজ্‌ছে! উত্তর দিলাম, "আমি টাকার কথা কিছুই জানি না—তবে চেষ্টায় আছি, চিঠি দিয়েছি!" খেলা যাক্ একটু। যাই হোক্ সে আমায় 'এপ্রিল্ ফুল্' করবার মতলব করেনি, এটা ঠিক! এ সন্দেহটাও মনে আস্‌ছিল এক একবার! সে সত্যই নির্ব্বুদ্ধিতার কায ক'রে সর্ব্বস্ব খুইয়েছে, না, আমায়ই নির্ব্বোধ বানাচ্ছে? তাই-ই যদি 'বনি,' বন্‌লামই বা!—কি হবে এমন তা'তে!

১লা বৈশাখ। বৈশাখ, বৈশাখ। আজ আর বিদেশীর দিন-তারিখ নয়, আজ প্রাণের মধ্যে সাড়া জাগাবার লোক এসেছে!

> হে ভৈরব! হে রুদ্র বৈশাখ!
> ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
> তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু—তুলি মুখে
> পিনাক করাল
> কারে দাও ডাক?

আমাকেই কি?

> দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী!
> পদ্মাসনে ব'স আসি রক্ত নেত্র তুলিয়া ললাটে,

শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী !
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার,
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ
বিগত বৎসর করি ভস্মসাৎ,
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার ।
হে বৈরাগী, কর শান্তি পাঠ ।

*   *   *

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ,
তোমার ফুৎকারক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক্ নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ সনে
আকুল আকাশ,
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ ।
তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল, দাও পাতি নভস্থলে,
বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া—"

কা'কে ?—"জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-তৃষ্ণা"-তপ্ত চিন্তাবিকল লক্ষ কোটি নরনারী-হিয়াকে ? আর এই চারটি সাধারণ অবস্থা অতিক্রম ক'রে যে জীব তাদের জীবনে আরও একটা অসাধারণ তাপ সৃষ্টি করেছে—তাদের ? তাদের হৃদয়েও এই বৈরাগ্যের গৈরিক অঞ্চল পাততে পারবে কি ? পার যদি—এস তবে !

ওগো, তোমার নাম না কি আবার মাধব ? কেউ কেউ বলে মাধবী রাণী ? হাসি পায় ! কে রেখেছে—এ নাম, কে

রেখেছে? তারাই,—না? তোমার এই রুদ্র রূপকেও এমন কমনীয় ব'লে আর কা'রা কল্পনা করবে সেই সৃষ্টিছাড়ারা ছাড়া?

এ কি স্বপ্নাতীত সংবাদ? দিদি লিখছেন—"কাকার এই শীর্ণ শরীরে এ গরম তিনি সহ্য করতে পারবেন না। ডাক্তারও পরামর্শ দিলেন ঠাণ্ডা দেশে নিয়ে যান এ সময়টা! নৈলে অসুখ বেড়ে যাবে! ২।৪ দিনের মধ্যেই আমরা রওনা হচ্চি। টেলিগ্রাম দেব,—হাওড়ায় থাকবে, তোমার কাছে গিয়েই তাঁর রাস্তার কষ্ট সাম্লে নিতে হবে।"

সে ২।৪ দিন ত ব'য়ে চল্লো! এক একবার মনে হচ্ছে, পালিয়ে যাই কল্কাতা ছেড়ে। কিন্তু পারলাম না ত! কি করব আমি? পারব ত! যেমন ক'রে এত দিন পেরেছি, এখনও পারব ত? নিজেকে যে বড় দুর্ব্বল মনে হচ্চে! এই দীর্ঘ দিনের—কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না। কেবল দেহ-মন কেঁপে কেঁপে বলছে—আসছেন! তিনি আমার এই তুচ্ছ ঘরে অতিথি হ'য়ে আস্ছেন!—কিন্তু আমি তাঁর সম্মান রাখ্তে পারব ত? কোন অসম্মান ক'রে ফেল্ব না ত!—আর সেই পিতৃতুল্য স্নেহময় হৃদয়—যাঁকে আমি অতি অকৃতজ্ঞের ব্যবহারই দিয়েছি তিনি আমায় ক্ষমা ক'রে আবার আমারই ঘরে আসছেন? এও কি আমার সহ্যের জিনিষ? এক একবার মনে হচ্ছে, ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠ্ব বুঝি।

এইবার আমার দিদি আস্ছেন তাঁর ভাইয়ের ঘরে।

১০ই বৈশাখ। এসেছেন তাঁরা আজ ৩ দিন! ওঃ, কি হ'য়ে গেছেন কাকা! বাঁচবেন কি আর বেশী দিন? মনে যে হয় না! এত বড় অকৃতজ্ঞের উপরও কি অপরিবর্ত্তনীয় স্নেহ তাঁর! কিন্তু এই-ই যে এঁর স্বরূপ! স্নেহপাত্র যত দোষই করুক—অন্তরকে যতই পিষে দিয়ে যাক্, তবু এ অমর যে মরে না! স্নেহ প্রেম সবই এক রসায়নেরই অবস্থাভেদে—পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বই ত নয়! তাই এই হত[illegible] তাঁর শীর্ণ বুকের কাছে যাবামাত্র হাত বাড়িয়ে তাকে [illegible]লেন।—আজও মনে আন্‌তে পার্‌ছি না, তাঁর সেদিনের মু[illegible]টা! দিন চ'লে যাচ্ছে,—বড় ডাক্তার দেখছে। যদি রক্ষা পান—দেখা যাক্! দেশে যেতে দেওয়া হ'তে পারে না। অন্য বাসা করার কথায় আপত্তি করা আমার সাজে না, ওঁদের অসুবিধা বা কষ্ট হ'তে পারে বৈ কি! কিন্তু দিদি সে কথাটা আমলই দিলেন না! আমি কিন্তু বড় কুণ্ঠা পাচ্চি; সগুণা পাছে কিছু মনে করেন!

যিনি বাপের চেয়েও স্নেহশীল—যাকে আপনার দিদির চেয়েও দু-এক বিষয়ে বড় মনে হয়, তাঁরা আমার এই অন্ধকার নিরানন্দ ঘরে দুদিনের আলো দিতে এসেছেন; কিন্তু এমনই আমার ভাগ্য যে, তাঁদের জোর ক'রে "যেতে পাবেন না" বল্‌বার আমার অধিকার নেই! বরং আছেন ব'লে, তাঁরা আমার উপর এই অহেতুকী স্নেহের পক্ষপাত দেখাচ্ছেন ব'লে কুণ্ঠিতই হ'য়ে যাচ্ছি! আমি যে এর যোগ্য নই!—কিছু মনে করেন পাছে তিনি?

এই সব লেখা বন্ধ কর্‌ব এখন দিনকতক। ভাল নয়—মন নিয়ে আর তার ভাষা নিয়ে এমন নাড়াচাড়া করা ভাল নয় এখন। আমি যেন কায়মনোবাক্যে আমার এই ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যের উপযুক্ত থাক্‌তে পারি!

কেবল একটি কথা ক'য়ে যাই! কে,—কে এসেছেন আমার এই ঘরে অতিথি হ'য়ে? জানি তিনি অতিথি মাত্র, থাক্‌বেন না বেশীক্ষণ! [illegible] প্রণাম—প্রণাম! প্রণাম করি আমার এই দিনগুলিকে। আর "হে নববর্ষ, তোমারে আজিকে প্রণমি আমি [illegible] শতবার!" অনেক রাত,—ঘুমে চোখ বুজে আস্‌ছে।

২০শে বৈশাখ। হরেনের চিঠি এলো। আমার অস্বীকারে সে অগাধ জলে পড়েছে। বড্ড সরল ভালমানুষ লোকটি। নৈলে এমন ক'রে সর্ব্বস্ব খোয়ায়? জিজ্ঞাসা করেছে, তার দিদি বা সগুণাকে আমি এ খবর দিয়েছি কি না! এও কি আমার দেবার কথা? ওঁরা যে এখানে, সে খবর পাবার আগেই তার এ চিঠি রওনা হয়েছে বুঝছি।—দিদির কাছে বেশ একটু অপ্রস্তুত হলাম। সগুণার কাছেও। বিলাতের ডাক পাবার দিন জেনে দিদি উন্মুখ হ'য়েই ছিলেন,—চিঠিটা তাঁর সাম্‌নেই এল। অনেক দিন না কি তাঁরা হরে[illegible] খবর পাননি, (এই ব্যাপারেই বোধ হয়) এসেই আমায় [illegible] করেন, আমি তার চিঠি পাই কি না—সে কেমন আছে? সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম—'চিঠি পেয়েছি, ভাল আছে।' আজ বোধ

হয় প্রত্যাশা করছিলেন, হরেনের চিঠিখানা আমি তাঁর হাতেই দেব। তা দিলাম না দেখে একটু যেন বিস্মিত হলেন। বার দুই জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল আছে ত?" সগুণাও সামনে, অবশ্য তিনি কিছু বলেন নি। মাথা হেঁট ক'রে "হ্যাঁ" ব'লেই স'রে আসতে হ'ল।

২৫শে বৈশাখ। মনে করি লিখব না; কিন্তু আমার এই খাতাই যে বন্ধু—আশ্রয়; এর সঙ্গে কথা না কইলে থাকতে পারি না যে। মনের অনেক কিছু এতেই নামিয়ে হাল্কা হই।—আজ দিদির ভাইয়ের চিঠি এসেছে, ঠিকানা বদল হ'য়ে! হরেন একসঙ্গেই দুই চিঠি লিখেছিল বোধ হয়—এখানা মধ্যদেশ ঘুরে আসতে এই ক'দিন দেরী হ'ল। সে নিশ্চয় কিছু লেখেনি, তবু আমার এত ভয় লাগছে কেন ওঁদের সামনে যেতে? সমস্ত দিন দিদিকে কেমন ভার ভার দেখাচ্ছে যে! না জানি, কি আছে আবার কপালে!

২৬শে বৈশাখ। মন অন্তর্যামী। সকালে উঠেই কাকা বল্লেন, "নীরু, একটা বাসা," তাঁর মুখ দিয়ে যেন শব্দটি বেরুচ্ছিল না। 'এখনি খোঁজ করছি' ব'লে উঠে পড়তেই ক্ষীণস্বরে আবার বললেন, "যদি কাছাকাছি পাও, তারই চেষ্টা দেখ আগে।" হাসি এল একটু!—কোন্ ভাগ্যে আমার এঁর এতখানি স্নেহ কপালে জুটেছে? পরিহাস নয় কি অদৃষ্টের?

বাসা পেয়েছি, তবে কাছে নয়—দূরেই। কাছে ত খুঁজিনি, কেন সে উঞ্ছবৃত্তি? সগুণা তাতেও কিছু ভাবতে পারেন!

কাল তাঁরা যাবেন সেখানে। ইতোমধ্যে দিদি আমায় এ কি হুকুমজারী করলেন? তাঁকে তাঁর গ্রামে রেখে আসতে হবে? এ কি সম্ভব? কাকা যেটুকু সুস্থতা পেয়েছেন, সমূলে নাশ হবে তা হ'লে! যাই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে! এ হ'তেই পারে না!

২৮শে বৈশাখ। আমার জীবন-খাতা! তোমায় এটুকু হ'তেই বা বাদ দিই কেন?—তোমার বুকে লেখা থাক্ সবই আমার! দিদিকে সে দিন খুব জোর ধ'রে 'যেতে পাবেন না' বলায় ক্রমে তিনি উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে ফেল্লেন "কেন আমি চ'লে যাচ্ছি, তা জান? তুমিই আবার জোর করছ আমায় রাখতে?" আমি উত্তর দিলাম—"জানতে চাই না দিদি, কেবল আপনাকে এই বলছি, কাকাকে এ অবস্থায় ফেলে কিছুতেই যেতে পাবেন না!" আবার তিনি বল্লেন, "জান?—তোমারই জন্য—তোমারই অপমানে—"

আর্ত্তস্বরে বাধা দিলাম, "শুনতে চাই না, কেবল আপনাকে থাকতে হবে, এই বলতে চাই।"

"তোমারও যদি সহ্য হয় নীরেন, আমার এত সইবে না।"

"আমারই জন্য সইতে হবে, নৈলে আপনি কিসের দিদি?"

তখন তিনি যেন একটু ঠাণ্ডা হলেন। চোখ দিয়ে তাঁর টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল। একটু পরে বল্লেন "হরেন আমায় সব লিখেছে, টাকা নষ্ট হ'য়ে যাওয়া, তোমায় সে খবর লেখা—আর তার দিনকতক পরেই পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া—

সব। তুমি বুঝি সে টাকা পাঠানো অস্বীকার করেছ? এই আমার নির্ব্বোধ ভাই আমায় লিখেছে, তবে বুঝি আমরাই তোমার চিঠিতে এ খবর জেনেছি, আর সগুণা কোন রকমে এই টাকা পাঠিয়েছে। সগুণা ত এ কথা প'ড়ে রেগে আগুন! 'তিনি মনে ভাবেন কি আমাকে? আমি কি তাঁর জন্য টাকা চুরী কর্‌তে গেছি—না যাঁর একান্ত অমতেও তিনি বাহাদুরী ক'রে বিলাত গেছেন, তাঁর কাছ থেকেই ওঁর নির্ব্বুদ্ধিতার বাহবা দিয়ে ভিক্ষে ক'রে নিয়েছি? আমার বৃদ্ধ বাপ রোগ-শয্যায়, এমন কথা তিনি মনে করেন কোন্ আক্কেলে?' কত ক'রে সগুণাকে ত শান্ত কর্‌লাম। হরেন লিখেছে, সগুণা যদি না পাঠিয়ে থাকে, তবে এ নিশ্চয়ই নীরেনের কায, তাকে চিঠি লিখে তুমি জান—তোমার কাছে সে কখনই অস্বীকার করবে না। এ কথার উত্তরে আমি 'যে লুকিয়ে রাখতেই চেয়েছে এত বড় কথা, তাকে কেন আমি এর জন্য উদ্ব্যস্ত করতে যাব' এইটুকু বল্‌তেই আবার সগুণার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে, 'এ আর জানাজানি কি? কার আর এত মাথাব্যথা?' তার মুখ দেখে আমার কথা যোগাচ্ছিল না, তবু বল্‌লাম, 'তবু মাথাটা ঠিক ক'রেই তাতে কোপ মার্‌তে হবে বৈ কি।' তাতে সে বল্‌লে,—"

দিদি হঠাৎ থেমে গেলেন। বোধ হয় আমার মুখের দিকেই তাঁর নজর পড়েছিল। থাম্‌তে দিলাম না।

"বলুন,—যদি বল্‌লেনই, তবে শেষ করুন।"

দিদি ধীরে ধীরে বল্‌লেন,—"সে না কি এখানে আসার ক'দিন পরে এ সবই জান্‌তে পেরেছে।"

"কি ক'রে দিদি? কে বল্‌লে?"

"তোমার ডায়েরী! তুমি না কি কবে তাকে ছাদে ফেলে এসেছিলে। তার রাত্রে ঘুম না হওয়ায়, ছাদে বেড়াতে বেড়াতে সেখানা তার পায়ে ঠেকে। আলোয় এনে গল্পের খাতা মনে ক'রে পড়্‌তে গিয়ে হরেনের এই খবরগুলো সে বুঝ্‌তে পারে। এই দেখ—এই জন্যই আমি বল্‌তে চাই-নি"—বল্‌তে বল্‌তে দিদি উঠে আমার হাত ধর্‌লেন। কৈ, আমি ত কিছু করিনি—কেবল—যাক্! এত বড় একটা খবরে—এই সুধা আর বিষের সমান পাল্লার তৌলে বিষের ভাগই ভাগ্য ভোগ কর্‌ছে! তাই আর্ত্তস্বরে বল্‌লাম—"এতে আমার অপরাধ কি হ'ল দিদি?"

"আজ থাক্ ভাই!"

"না—না—বলুন,—এক দিনেই শেষ হোক্",—বল্‌তে বল্‌তে তাঁর পায়ে হাত দিয়েছিলাম বুঝি; তিনি আমার মাথাটা কোলের কাছেই প্রায় টেনে নিয়ে বল্লেন, "দাদা আমার, বল্‌ছি—একটু স্থির হও।" কিন্তু সে কাঁপুনি কি সহজে থামে? বাধ্য হ'য়ে তিনি শেষে বল্লেন—"কেন আমি হরেনকে এ সাহায্য কর্‌তে গেছি—সে চ'লে এলে কি ক্ষতি ছিল আমার? যা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম—কাজেও তাই কর্‌লাম না কেন? সগুণা আমার এই অপরাধ খুব বেশী

ক'রেই নিয়েছেন!" আবার একটু উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দিদি আমায় বল্‌তে দিলেন না। "তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না, ভাই। আমিও সে উত্তর দিয়েছিলাম যে, 'হরেনের সে বন্ধু, হরেন ত তাকে ছাড়া আর কাউকে এতে সাহায্য বা পরামর্শ চায়নি, সে বন্ধুর উপযুক্ত কাযই করেছে।' তাতে সগুণা আরও বেশী রেগে ব'লে উঠলো, 'বন্ধু? বন্ধুত্বের জন্য? আপনি জানেন না দিদি।' আর কিছু সে বল্‌লে না। বুঝলাম, তোমার খাতায় তা হ'লে সে আরও কিছু পড়েছে। মাত্র হরেনের কথাই নয়। তাই ক'দিন তাকে কেমনই এক রকম দেখছিলাম, তখন কারণ বুঝতে পারিনি। আজ বুঝলাম।"

মাথায় রক্ত আর যেন ধরছিল না। তবু শেষ চেষ্টায় ক্ষীণস্বরে বল্‌লাম, "আর কিছু আছে দিদি?"

"আছে,—এই সঙ্গে সেটুকুও শেষ ক'রে ফেলি। সে তোমার এ ঋণ রাখবে না। যেমন ক'রেই হোক্‌ শোধ করবে।"

কতক্ষণ পরে জানি না—দিদিকে সান্ত্বনা দিলাম—"তার জন্য তুমি দুঃখ পাচ্ছ কেন দিদি? এতে আমার অপমানেরই বা কি আছে? সত্যই ত, হরেন আমার কে? ভাইও না—বন্ধুও না! তাঁদের সম্পর্কে—তাঁদের পরিচয়েই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। সগুণা যদি তাঁর ভাবী স্বামীকে আমার কাছে ঋণী থাকৃতে না দেন, সে এমন দোষের কথাই বা কি? যা করতে বল্‌বেন তিনি, তাতেই আমি সম্মত হব। যতটা

সম্মানিত করেছেন আমায়, এই-ই যথেষ্ট, এতটাও ত আমি আশা করিনি দিদি! কে আমি তাঁদের যে, তিনি আমার এই উপকার তাঁর স্বামীর জন্য মাথা পেতে নেবেন? এতে আমি কিছু মনে করব না, আপনিও আমার জন্য কোন দুঃখ নেবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

দিদি যেন আমার সব কথা কান দিয়ে শুন্‌লেন না; কেমন যেন অন্যমনা হ'য়ে রইলেন। একবার কেবল বল্‌লেন, "আচ্ছা, দু-চার দিন পরেই না হয় যাব। এর আগেই এ খবর যখন সে জেনেছে, তখন ত কোন উচ্চ-বাচ্য করেনি, আজ হরেনের চিঠিতে এ কথা দেখে সগুণার এত রাগ হ'ল কেন? তোমার উপরও ত কৈ এমন বিরক্ত হ'তে দেখিনি এ ক'দিন? হরেনের উপর যদি অভিমান হ'য়ে থাকে, এ ক'দিন তা একটুও বুঝিনি! মেয়েটি একটি প্রহেলিকা! আমিই এখনও এত দিনে এ'কে বুঝলাম না, তা অন্যে বুঝবে কি?" তাঁর স্বগত উক্তির সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না। আমি তখন নিজের মাথার ঘায়েই পাগল! চিন্তিত-ভাবে তিনি শেষে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমিও একা হ'য়ে যেন বাঁচলাম!

বাসায় যাবার আগে দিদি যখন জিনিষপত্রের গোছগাছ করতে ও কাকাকে কি রকম সাবধানে স্থানান্তর করলে তাঁর শরীর একটুও টের পাবে না, সেই সব উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ সগুণা আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। এমন ক'রে একা আমার সম্মুখে এসে তিনি কখনও দাঁড়িয়েছেন ব'লে

ত মনে হয় না, তাই বুক্‌টা ধড়াস্ ক'রে উঠলো। সবই সইবার জন্ম লোহার মত ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা করলেও সেই আচম্বিতে হাতুড়ীর মত ঘা যেন তাকে একটু কাঁপিয়েই দিলে। সগুণা কি সে শব্দটাও শুন্‌তে পেয়েছিলেন? সহসা তুই চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন,—আমিও চেয়েই ছিলাম। তখনই তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন—কিন্তু দিদি যেমন বলেছিলেন, সে রকম রাগের রক্তিমা ত দেখলাম না। বরং যেন মনে হ'লো, ভয়ানক বিবর্ণ মুখ। চোখোচোখি হ'তে আরও যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তখন কিন্তু এ সব দেখবার আমার সময় ছিল না। এখন মনে মনে সেই দৃশ্যকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখছি। হয় ত এও ভুল। তখন কেবল তুই চোখ মেলে তাঁর কাজগুলি দেখে যাচ্ছিলাম মাত্র। সম্পূর্ণ নিরাভরণ শরীরে আমার সাম্‌নে তিনি কতকগুলো গয়না রেখে দিলেন—হার, চুড়ি, বালা, ইয়ারিং, ব্রোচ এই রকম অনেকগুলো কি কি। চিনলামও তাদের! সগুণা মৃতুস্বরে বল্‌লেন, "এগুলি আপনাকে রাখতে হবে,—যত দিন না আমি আপনার ৫ হাজার টাকা দিতে পারি।"

উত্তর দিলাম, "আচ্ছা।" আর কিছু না ব'লে তিনি চ'লে যাচ্ছিলেন। তুয়োরের কাছে গিয়ে আবার ফিরে বল্‌লেন, "অন্য বাসায় গেলেও বাবার ভার আপনার উপরেই,—এটুকু মনে রাখবেন!" ঘাড় নেড়ে স্বীকার কর্‌লাম—"রাখব।" স্ত্রীজাতিসুলভ এই করুণা—এইটুকুও যে শেষে পেয়েছি, এই আমার ঢের। কিন্তু চিন্‌তে যেন ভুল হয় না এই দয়াটুকুকে।

বাক্সটা টেবিলের উপর ধরা আছে, চেয়ে চেয়ে দেখছি বাক্সটাই ছুঁতে সাহস হয় না—খুলে দেখা ত দূরের কথা! ওর ভেতরের একটি জিনিষ একটি আংটীও যদি চোখে দেখবার বা স্পর্শ কর্‌বার অধিকার আমি কল্পনায়ও কখনও পেতাম, নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে কর্‌তাম! আর আজ? ঐ কাষ্ঠ-আবরণের ভিতর থেকেই সেগুলো তাদের আগুনের মত ঔজ্জ্বল্য দিয়ে আমার মনের চোখটাকে যে পুড়িয়ে তুল্‌ছে! তারা সবগুলি আমার কাছেই এসেছে স্বেচ্ছায়, কিন্তু কি ভাবে? সেই জিনিষগুলিই ত, কিন্তু যে এদের চিন্তাতেও এক দিন কৃতার্থ হ'ত, আর আজ তাদের অস্তিত্ববোধে সে কেন পুড়ে মরছে? কিসের দাম তবে? বস্তুর নয় ত!

আর এই খাতা? এই ডায়েরী! এ তাঁর হাতে উঠেছে, তিনি পড়েছেন। এর কল্পনায়ও বোধ হয় এক দিন আমি পাগল হয়ে যেতাম, আজও একরকম হচ্ছি, কিন্তু সেও উল্টো ভাবের আঘাত! সেই প্রার্থিত ব্যাপারই, কিন্তু কি বিপরীত সংঘর্ষ!

হঠাৎ হুঁস এলো, আজ ৭।৮ দিন তাঁরা চ'লে গেছেন, আমার এক দিনও যাওয়া হয়নি। এ যেন নিজের দুঃখ আর অভিমানই জানানো হচ্ছে। কি অধিকার আমার এ'তে? তিনিও যেমন সাধারণ ভদ্রতা রক্ষা ক'রে যেতে ব'লে গেছেন, আমারও তাই যাওয়া উচিত। তা না গিয়ে এই দুঃখ জানাবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা—এ কেন?

এ কি? এ কার হাতের অক্ষর! কে চিঠি লিখেছে আমায়? বুঝ্‌ছি, এও সেই ভদ্রতারই আহ্বান। তবু বুকের এ ধড়ফড় আন্দোলন থামিয়ে পড়তে পারি না যে! অনেকক্ষণ পরে পড়তে পার্‌লাম,—

"মান্যবরেষু—

দিদির গ্রামের একটি বুড়ো লোককে আনিয়ে দিদি তাঁর দেশে চ'লে গেছেন। বাবা সেই হ'তে ভাল ক'রে কথাই কইছেন না কারো সঙ্গে, ভয়ানক বিষণ্ণ হ'য়ে আছেন। তিনিও নিজের দেশে যেতে চান, আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার এসে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যান। ইতি—

সগুণা।"

দিদি সত্যই চ'লে গেছেন তবে এইবার? শেষ দেখাটাও হ'ল না, একবার প্রণাম কর্‌তেও দিলেন না, কিন্তু যদি না-ই দেন—কি জোর আছে আমার তাঁদের কাছে আমার এই আত্মীয়তার দাবী কর্‌তে? সগুণাও আমার সেই অধিকার খর্ব্ব ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ নই আমি তাঁদের। আবার তাঁরই এইটুকু আহ্বান, আমাকে দরকার আছে ব'লে এইটুকু জানানো। এই যে নিতান্তই যন্ত্রণার সান্ত্বনা। এ'কেও অস্বীকার ক'রে যাব না তাঁদের কাছে, ততখানি স্পর্দ্ধা দেখানও ত আমার পক্ষে অসম্ভব! এটা কর্‌তে পারে কা'রা? যাদের এতটুকুও জোর আছে। আমার কি তা আছে? কে আমি

তাঁর? মিত্র ত নই-ই জানেন—উপরন্তু—থাক্। পারি না, পারি না, আর চোখেও দেখতে সে শব্দটাকে!

পরদিন। গিয়েছিলাম। সিঁড়িতেই সগুণার সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখেই তিনি যেন মাথা নামিয়ে মুখ ফিরালেন। তাঁর সেই কুণ্ঠিত ভাবটা বুঝে তাড়াতাড়ি আমিও নমস্কারটা সেরে নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলাম, তাঁরই মৃদু কণ্ঠ আমাকে থামিয়ে দিল। "শুনুন।" দাঁড়িয়ে গেলাম। আবার শুনলাম, "এ দিকে এসে একটা কথা শুনুন।" অগত্যা সিঁড়ি ক'টা নেমে খানিকটা নিকটস্থ হ'য়েই দাঁড়াতে হ'ল। তখনকার অবস্থা বেশ মনে পড়ছে। নিশ্বাস যেন পড়তেই চায় না! আবারও বুঝি কি শুনতে হবে!

কি যেন কয়েকটা কথা তিনি বললেন, কিন্তু কি হয়েছিল আমার, জানি না, এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। কপালের উপর অন্তরের সমস্ত জোর প্রয়োগ ক'রে বোধ হয় ভুরু দুটো খুব কুঁচকে প্রতিপ্রশ্ন করলাম, "কি বলছেন?" মাথার ভিতরের সমস্ত রক্ত কানের কাছে কি সোঁ সোঁ শব্দই করছিল তখন। তিনিও যেন একটু জোরের সঙ্গে এইবার মুখটা তুললেন—মুখ অত পাণ্ডু কেন? কি হয়েছে তাঁর? কেন—কে ব'লে দেবে আমায়? আঃ, এ কি পাগলামি! আবারও? এখনও?

তিনি বললেন, "বাবাও তাঁর গ্রামের সেই পচা বাড়িতে, সেই জঙ্গলে যেতে চান। এই অবস্থায় সেখানে গেলে বাঁচবেন না! আপনি মত দেবেন না তাঁর কথায়।" এইটুকু ব'লেই তিনি

আমার আগেই ত্রস্তে উপরে উঠে চ'লে গেলেন। আমি একটু পরে—তিনি চোখের আড়ালে চ'লে গেলে, ধীরে ধীরে তাঁর অনুসরণ কর্‌লাম।

কাকার সঙ্গে দেখা হ'ল। দেশে যাবার উপযুক্ত সুস্থতা দেখাবার জন্য তিনি জোর ক'রেই যেন উঠে বসেছেন। অথচ মুখে ও শরীরে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ দিব্য পরিস্ফুট! আমায় দেখে ব্যস্তভাবে বল্‌লেন, "এসো নীরেন, তোমাকেই মনে মনে ডাকছিলাম। এ দিকে যখন এসেছি, তখন নিজের দেশ-গ্রাম না দেখে' ফিরে যাওয়া উচিত নয়। আমরা দু'চার দিনের মধ্যেই দেশে যাব, তোমার কি এখন সময় আছে? একটু আধটু দরকার হ'লে—" বলতে বলতে কুণ্ঠিতভাবেই যেন তিনি থাম্‌লেন। তাঁর এই কুণ্ঠা—এও যেন একটা পাথরের টুক্‌রোর মত বুকের উপর প'ড়ে আঘাত দিল আমায়। তিনি নিজেও দূরে আস্‌তে বাধ্য হয়েছেন, আমায় এক দিন ডাক্‌তেও পারেননি, বোধ হয়, সেই জন্য এই কুণ্ঠাটুকু তাঁর মনে জন্মেছে, কিন্তু আমি ত জানি, তাঁর অনাবিল স্নেহে একটুও ময়লা মেশেনি! যা যা ঘটছে, সবই যে আমার ভাগ্য-ফলে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি সহজ ভাবেই বল্‌লাম, "সময় যথেষ্ট আছে, আপনাকে পৌঁছে দিয়েও আস্‌তে পারি, কিন্তু আপনার এ শরীরে ডাক্তার-কবিরাজ-হীন পাড়াগাঁয়ে যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। এখন সেখানের স্বাস্থ্যও—"

আমায় বাধা দিয়ে তিনি বল্‌লেন, "এইবার নিতান্ত অন্যায়

কথা বল্‌ছ নীরেন—এ গরমে পাড়াগাঁয়েই সব চেয়ে ভাল থাকা যাবে। কলকাতা আমার সহ্য হচ্ছে না। এই ভাপ্‌সা ধরা পচা গরম আর গোলমাল, এর চেয়ে ওদিকের সেই প্রচণ্ড রোদ আর হা-হা-করা বাতাসও ছিল ভাল। ডাক্তারের কথা বল্‌ছ, ছোটবেলায় যখন গ্রামে থাকৃতাম, তখন আমাদের গ্রামের হরিশ কবিরাজ তার গাছগাছড়ার ওষুধে এই সব পেটের দোষ কি আশ্চর্য্য রকমই যে ভাল করৃত দেখতাম। যদি দেখতে, তুমিও বুঝতে! বিশ্বাস না হয়, আমার কাছে থেকে দু'দিন দেখবে চল, আমি যদি সেরে না উঠি ত—" বলতে বলতে দুয়ারের পানে দৃষ্টি পড়ায় কাকা হঠাৎ থেমে গেলেন, আমিও চেয়ে দেখলাম, সগুণা তাঁর বাপের পথ্য হাতে নিয়ে সে ঘরে আস্‌ছেন। তাঁর সেই নিরাভরণ হাত দু'খানি একসঙ্গেই দু'জনার চোখের সাম্‌নে পড়বামাত্র কাকা একবার চকিতে আমার পানে চেয়ে মাথা নামালেন। ভিতরটা হঠাৎ আমার একটা প্রবল আঘাতে যেন দুলে উঠলো। ব্যথায় লজ্জায় অধীর মনের ভিতর আবার প্রশ্নও উঠতে লাগল, তিনি কি জানেন আমার এ অপমানের কথা? আমার সেই অনধিকার-চর্চ্চার ফল? মেয়ের এই নিরাভরণা মূর্ত্তিতে কি মনে করেছেন তিনি? নিজের কথাটা তখনই আবার বিদ্যুতের মত আর একটা আশঙ্কা এসে মনকে ভুলিয়ে দিলে। সগুণার উপর তিনি এর জন্য রাগ করেননি ত? এক দিন মেয়ের উচিত দৃঢ়তা তিনি সহ্য করতে পারেননি, আর আজ সেই হরেন্দ্রর জন্য সগুণার এই স্বাধীনতায়

তার উপর তেমনি চ'টে উঠেননি ত? কিন্তু সে রকম একেবারেই মনে হ'ল না। মাথা নীচু ক'রে ম্লান মুখে কাকা বল্‌লেন, "না নীরেন, তুমিও বাধা দিও না। আমি দেখছি, সগুণা এখানে ভাল থাকৃছে না। পাড়াগাঁ দেখবার জন্ত ওর চির-দিনেরই সাধ ছিল। পড়াশুনার জন্য, আর আমারই সময় না হ'য়ে উঠায় এ পর্য্যন্ত দেখতে পায়নি। কলকাতা হ'তে সেখানে গিয়ে সগুণাও আনন্দ পাবে, আমিও ভাল থাক্‌ব ব'লে আমার ধারণা।"

"বাবা—কিন্তু—" মেয়েকে কথা কইতে না দিয়ে কাকা ব্যস্তভাবে বল্‌লেন, "কিন্তু আমি বল্‌ছি, আমি ভাল থাকব। পরীক্ষা ক'রেই দেখ না একবার।"

সগুণা আর উত্তর দিলেন না। আমি একটু পরে বল্‌লাম, "কবে যেতে চান তা হ'লে?"

"যত শীঘ্র হয়, তুমি একটু দেখে-শুনে ব্যবস্থা ক'রে দাও, এখন ত আমরা দু'টিমাত্র, হরেন্দ্রর ভগ্নী চ'লে গেছেন জান বোধ হয়?"

অভিমানে কাকা দিদির নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে পার্‌লেন না। কষ্ট হ'ল একটু, আমি যে জানি, তিনি কেন চ'লে গেছেন। তাঁর এই সম্পূর্ণ পর ভাইটির জন্যই তাঁর আপন জনদের ছেড়ে গেছেন যে!

আর বাক্যব্যয় না ক'রে তাঁদের সব গুছিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে গ্রামে পৌঁছেও দিয়ে এলাম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, সম্পূর্ণ পরও

পথে যেটুকু অধিকার স্বচ্ছন্দে নিয়ে থাকে, আমি সেটুকুও নিইনি। কাকা দু'চার দিন থাকতে ক'বারই বললেন, অবশ্য আগের মত অকুণ্ঠ দাবীর সঙ্গে নয়, তিনিও যেন মনে ভাবেন, সে অধিকার আর তাঁর নেই। এই তাঁর স্নেহের অযোগ্য পাত্র তাঁকেও যত ব্যথা দিয়েছে, নিজেও যতখানি যা পেয়েছে, খানিকটা বুঝি তিনিও বুঝতে পারেন, তাই তাঁর এ কুণ্ঠা! কিন্তু আমার যে এতেও লাগে! হায় অভাগ্য! এটুকুর সম্মান রাখবারও তোর ক্ষমতা নেই!

কাকা যা বলেছেন, সত্যই। সগুণাকে এ একবার খুব উৎসাহপূর্ণ দেখাচ্ছিল। কলকাতা ছেড়ে ...ত সত্যই তিনি উৎসুক ছিলেন, কেবল বাপের অস্বাস্থ্যের ভয়েই প্রথমে আমাকে ও রকম বলেছিলেন, বুঝছি। ভয়টা শেষ পর্য্যন্তও যে একেবারে ছিল না, এমন বোধ হয় না, বিশেষতঃ নতুন দেশ, নতুন সঙ্গ, নতুন সমাজ, তার মধ্যে গিয়ে পড়তে সকলেরই কিছু দিন ভাবনা হ'য়েই থাকে। তাই বোধ হয়, মাঝে মাঝে তাঁকে ম্লান, আবার তেমনই মাঝে মাঝে উৎসাহ-ভরাও দেখাচ্ছিল। নতুন স্থানের আকর্ষণও যে অমোচ্য, বিশেষ তার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তে যদি কৌতূহল থাকে!

১লা আষাঢ়। আবার এই একটা দিন আজ, কিন্তু কাহের কাছে? সুখও যদি না থাকে, অন্ততঃ স্মৃতি র'য়ে একটু

কিছুও যাদের সম্বল আছে, তাদেরই কাছে আজ সেই ১লা আষাঢ়। যেদিন কবির হৃদয় রামগিরির সানুদেশ হ'তে সুদূর অলকাধামে উড়ে চলেছিল, সেদিনের নবীন মেঘ-বাহনে! এ দিনে আমার মত ধিক্কৃত জীবনের কি বা বল্‌বার আছে, কি-ই বা ভাববার আছে? ১লা জ্যৈষ্ঠ আর ১লা আষাঢ়ে কোনই ত প্রভেদ নেই! তবে দুঃখ এইটুকু, যখন জীবনে কাব্যের অনুশীলন মাত্র ছিল, এই গত বছরের কথাই বল্‌ছি, কি ভাবে আজকের দিনকে অভিনন্দিত না করেছি? তখন যে জানা ছিল, কল্পলোকের সেই মানসী-প্রতিমা—যাকে কবি প্রিয়া নাম দিয়াছেন, তিনি যক্ষ-বর্ণিত সুখ-সৌভাগ্যের সারভূতা সেই অলকাপুরীতে ব'সেও আমার পথ চেয়েই যেন দিন গণনা কর্‌ছেন, আর উৎসঙ্গে বীণা-নিক্ষেপ ক'রে আমার উদ্দেশেই গান গাইতে গাইতে "তন্ত্রী মার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্ ভূয়োভূয়ঃ স্বরমপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী" সেই মানসলোকের বিরহাতুরা "সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনী"র মূর্ত্তিই আমার আজকের গত বৎসরের দিনকে স্বপ্নমণ্ডিত ক'রে রেখেছিল যে, বাহ্য সত্যের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব না থাক্‌লেও অন্তরের অন্তর তাঁর অস্তিত্বেই সুখে মাতাল হ'য়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাঁর আসন কল্পনা ক'রে তাঁরই উপাসনায় বিভোর হ'ত! বর্ষায় তাঁকেই যক্ষ-বর্ণিত বিরহিণীরূপে, শরতে শারদশ্রীর হাস্যে, হেমন্ত-শিশিরের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপে, আর বসন্তে বাসন্তী রাণী ব'লে তাঁকেই সে চিন্তা করেছে—ডেকেছে—কিন্তু তাঁর

যে নিদাঘ-মধ্যাহ্ন-কান্তি নামে আরও এক রূপও আছে, এ কথা তখন এক দিনও মনে পড়েনি! সেই প্রোজ্জ্বলার তীব্র তেজে জীবনের সব স্বপ্ন-জালই যে ছিন্ন হ'য়ে যায়! জীবন তখন তৃণশূন্য প্রান্তরের মতই যে ধূ ধূ হু হু করতে থাকে! কোথায় থাকে তখন তা'তে আষাঢ়ের স্বপ্ন, শারদের মায়াজাল,—মিথ্যা —মিথ্যা, সবই মায়া, কিন্তু এ মায়া বৈষ্ণবের লীলারূপিণী তিনি নন! বৈদান্তিকের তীক্ষ্ণখড়্গধারিণী, মায়াবাদীর মিথ্যা মরীচিকাস্বরূপা ভ্রান্তি মাত্র!

যাক, কেন মিথ্যা এই কর-কণ্ডূয়ন! ভেবেছিলাম, আর বুঝি এই খাতাখানিকে স্পর্শ করতেও পারব না! অবশ্য আরও দু'একবার এ কথা ভেবেছি বটে, কিন্তু এবারের সঙ্গে তাদের কি তুলনা হয়? কিন্তু তবু ত আমার এই জীবন-কাহিনীতে আবারও রেখাপাত করছি! দিদির মুখের সেই খবরে ছুটে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলবার দুর্নিবার ইচ্ছায় এ'কে হাতে নিতেই এই জড় নির্ব্বাক্ বস্তু তার সমস্ত অন্তর-বাহিরকে মেলে যেন আমার চোখের সামনে ধ'রে নিঃশব্দ ভাষায় বল্‌লে,—"ছিঁড়বে? কা'কে ছিঁড়বে? একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখো! আমার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কার নাম—কার কথা—কার অনুভূতি মাখানো আছে দেখো একবার! পারবে আমা' ছিঁড়তে? দেখ দেখি ভাল ক'রে!"

সত্যই ত পারিনি! তার সেই অকথিত ভাষা শুনতে শুনতে স্তব্ধ হ'য়ে পাতার পর পাতা কেবল উল্টেই গিয়েছি, আর

তার পরেও আবার তার সেই ভাষা শুনেছি! 'আমি তাঁর পায়ে ঠেকেছি, হাতে উঠেছি, দৃষ্টিপূত হয়েছি, স্পর্শ পেয়েছি। আমি তাঁর, এই তোমার লজ্জার কারণ? আমার কাহিনী তিনি পড়েছেন, জেনেছেন, এতেই তোমার এত বিচলিত ভাব? কিন্তু আমি যে ধন্য হ'য়ে গিয়েছি! চেয়ে দেখ, আমার ত লজ্জার কোন চিহ্নই নেই? বরং—বরং যদি দেখতে জান ত দেখ, আমাঃ আমিত্ব এই স্বপ্নাতীত সৌভাগ্যে কি চরিতার্থ হ'য়ে গেছে! শুন্‌তে জান ত শোন, আমার সেই ভাষা! তোমার লজ্জায়—তোমার দুঃখে আমায় কেন তুমি নষ্ট করবে! আমি নিজের এই সৌভাগ্যটুকুকেই চিরদিন স্মরণ করব—এইটুকুই আমার জীবনের "সর্ব্বোত্তম সর্ব্বস্ব!" তুমি তোমার 'বিষ' নিয়ে যত পার পান কর। আমার অমৃতে আমি অমর হ'য়ে গেছি—আমায় তুমি নষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।' পারিনি—পারিনি ত এ'কে নষ্ট কর্‌তে! উপরন্তু যেন অবশ হ'য়ে আবারও তারই কলেবর বৃদ্ধি ক'রে চলেছি। এইবার বুঝেছি, এ'কে ত্যাগ করবার আর আমার ক্ষমতাই নেই।

২৬শে আষাঢ়। ঠিক পঁচিশ দিন পরে আবার আমার ডায়েরী লিখতে আসা। এবারে খুব দৃঢ়তার-সঙ্গেই এই কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। আবার তেমনই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা! দিদির চিঠি পেলাম, তিনি লিখেছেন,—

"ভাই আমার, হরেনের টাকার মধ্যে ৩ হাজার টাকা সগুণাকে পাঠালাম। তুমি জান, আমার বা আমার ভাইয়ের তোমার সে টাকা নিতে কোন বাধাই আসেনি, কিন্তু যে জন্ম আমাদের যৎসামান্ত সম্পত্তি বেচেও এটাকাগুলি তাকে পাঠিয়েছি, তা তুমি অন্ততঃ নিশ্চয় বুঝবে। সগুণা তার অলঙ্কারের অর্দ্ধেকও অন্ততঃ এখন ফিরিয়ে নিতে বাধ্য, এ কথা তাকে লিখে পাঠিয়ে—দিও কতক তার গহনা তাকে। আমাদের আরও যা কিছু আছে, বেচে বাকি টাকাও তাকে শীঘ্রই পাঠাব। তোমায়ও নিশ্চয় সে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবে। ভাই, তোমার দিদির ওপোর যেন একটুও রাগ ক'র না। আমি আমার ভবিষ্যতের সব সংস্থানই নির্ভয়ে নষ্ট কর্‌ছি, কেন না, জানি, আমার দু'টি উপযুক্ত ভাই আছে! (হরেন বেচারা তার দিদির জন্মই এটুকু পারেনি) বাকি ২ হাজার টাকা সগুণাকে পাঠাতে পার্‌লেই আমি তোমার কাছে গিয়ে পড়ব জেনো, কেন না, তা ছাড়া আর ত আমার জায়গা থাকবে না। হরেনকেও রাজি করিয়ে জানিয়েই এ সব কর্‌ছি। আশীর্ব্বাদ জেনো, ইতি—তোমার দিদি।"

জড়ের মত স্তব্ধ হ'য়েই আছি! তুচ্ছ নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে অধীর হ'য়ে থাকি, জগতের আরও কত দিকে ব্যথা, বেদনা, অপমানের আঘাত যে কত প্রচুরভাবে ব'য়ে চলেছে, তার সন্ধান কেউ রাখি না! দিদি আমার কাছে আস্‌বেন, এ খবর আমার পক্ষে আশাতীতই বটে, কিন্তু তবু তাঁর কথাও

ভাবতে হবে যে, এ আসায় কি তিনি আগের মত সুখী হবেন? তাঁর মুখের সেই অনাবিল হাসিটুকু, সেই শান্ত-স্নিগ্ধ ভাবটুকু আর দেখতে পাব কি? যত দিন তাঁর নিজের ভাই না উপযুক্ত হবে, তত দিন এই দুই দিনের ভাইয়ের কাছে এখন আর তিনি সুস্থ মনে থাক্‌তে পার্‌বেন কি? যত স্নেহই করুন আমায়, এ যে অসম্ভব—একান্তই অসম্ভব!

৪ঠা শ্রাবণ। দিনের পর দিন কেটে চলেছে। কৈ, আর কোন দিক্‌ হ'তেই ত কিছু আস্‌ছে না। আমার কপালের জন্য যত বাত্যা, বর্ষণ, বিদ্যুৎ সবই কি আমার দিদি বুকে ধ'রে তাদের শান্ত ক'রে দিলেন? তাঁরও যে আর সাড়া নেই! আর যে এমন ক'রে পারি না! যা পড়বার পড়ুক! আমি ত সগুণাকে নিজ হ'তে কিছু লিখ্‌তে পারব না কোন বিষয়েই! দিদির এ কাণ্ডে তিনিই কি সুস্থমনে আছেন? কখনই নয়। আমার সংস্রবমাত্রেই কি সকলের এত লজ্জা ও দুঃখের কারণ ঘট্‌ছে? কেন আমি মাঝ হ'তে হরেন্দ্রকে বাহাদুরী ক'রে টাকা পাঠাতে গেলাম! সে ফিরেই আস্‌তো না হয়, তার পরে যা হয় হ'ত! আমি না টাকা পাঠালে ত সগুণা এত অপমানিতা বোধ কর্‌তেন না, দিদিও এমন ক'রে গৃহহীনা সর্ব্বস্বহীনা হতেন না! এ আমাকে নিয়ে আমি আজ এ জগতের কোথায় লুকাবো?

হরেন্দ্রর চিঠি এলো। দিদির মত সেও লিখেছে, তার পরে সগুণার ব্যাপারেও যেন আমি বেশী ক্ষুব্ধ না হই, তা'কেও

যেন ক্ষমা করি, এই রকম দু'চার কথাও আছে। আমি ব্যথা পাব ব'লে সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠছেন দেখছি! ওগো স্নেহময় মানবহৃদয়, তুমি এ জগতে আছ, তাই মানুষ বেঁচে আছে। কিন্তু বিধাতা যার অদৃষ্টের তৌলদাঁড়ি নিজের হাতে নিয়েছেন, তার ভার লাঘব করবার সাধ্য যে কারও নেই গো!

৬ই শ্রাবণ। দিদি এলেন, আমার দিদি এলেন! সেই সৌম্যমূর্ত্তি ঈষৎ যেন মলিন, একটু যেন রং কালো হ'য়ে গেছে, এইমাত্র প্রভেদ। মুখের হাসিটি যেন আরও শান্ত, আরও করুণ! বালকের মত তাঁর পায়ের তলায় মাথাটা দিয়ে বল্লাম, "দিদি, সত্যি এবার থেকে আমায় নিজের ভাই ব'লে জানলেন? সত্যি?"

তিনি তাঁর স্নিগ্ধ হাতখানি আমার মাথার ওপোর দিয়ে বল্লেন, "এবার থেকেই ত শুধু নয় ভাই, সেই যে দিন হরেন তোমার কাছে আমায় রেখে যায়, সেই দিন থেকেই ত তাই জেনেছি।"

অনেক দিন পরে চোখে জল আস্‌ছিল, অতি কষ্টে সাম্‌লে নিলাম।

দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, "সগুণার কোন খবর পেয়েছ?"

"না।"

"গয়না পাঠিয়ে দিয়েছ তার?"

"না দিদি!"

"সে আমি বুঝতেই পেরেছি, আমি পাঠিয়ে দেব কাল

—দিও আমায়! আমি ৫ হাজার টাকাই পাঠিয়ে এসেছি তাকে।”

পরদিন দিদি এই কথা আবার বল্‌তেই আমি হাতজোড় কর্‌লাম। তিনি আমার পানে একটুখানি চেয়ে থেকে শেষে বল্‌লেন, “কি বল্‌তে চাও তবে তুমি?”

“আপনারা ত আমার জন্য কিছুই বাকি করেন নি, তবে এখন আর অন্য কিছুর জন্য ব্যস্ত হবেন না। সগুণা যা ভাল বুঝবেন, তাই করুন। আমি তাঁর সম্মুখে এই নিয়ে স্পর্দ্ধা ক’রে দাঁড়াব—এ হ’তে পারে না দিদি। আমার কথা বাদ দিয়ে একবার তাঁর কথাটাও ভেবে দেখবেন! আপনার এই ব্যাপারে তাঁরও—”

দিদি ক্রুদ্ধস্বরে আমার কথায় বাধা দিয়ে ব’লে উঠলেন, “তুমি চুপ কর ত নীরেন! সে মেয়েকে আমার বেশ চেনা হ’য়ে গেছে! যে আমার এই দেবতা ভাইয়ের মনে এমন—” ইত্যাদি কি যে ব’লে গেলেন কতকগুলো, তা আমার সব কানেই গেল না, কেবল বুঝলাম, আর বেশী কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, এখন ছল ক’রে একটু স’রে পড়াই বিধেয়। পালাতে যাচ্ছি—দিদি বল্লেন, “আমায় তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে রেখে এস নীরেন!”

“আস্‌ব দিদি—আর দুটো দিন থাকুন ভাইয়ের কাছে।”

দুটো দিন নয় পরদিনই কাকার টেলিগ্রাম। “এখানে ভয়ানক বর্ষা, আমার শরীর ভালই ছিল, কিন্তু সগুণা ভাল নেই।

গ্রাম ছাড়তে হ'ল, কাল পৌঁছাবো তোমার ওখানে।" আর ঘণ্টাকতক পরেই তাঁরা এসে পৌঁছাবেন। দিদি গোঁ গোঁ ক'রে বল্‌লেন, "দেখ দেখি, কাল যদি আমায় পাঠিয়ে দিতে!" আবার আমি হাতজোড় কর্‌তেই রাগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, "এই রকম হ'য়েই ত এতখানি অন্যায় করার স্পর্দ্ধা দিয়েছ তা'কে। ভয় নেই, আমিও ভদ্রতা রক্ষা কর্‌তে জানি, হাতজোড় কর্‌তে হবে না!"

এসেছেন তাঁরা! কাকা সত্যই বেশ সেরেছেন। এ বয়সে সেই কুটিল রোগকে ঠেলে এতখানি সুস্থতা সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌বেন এ যেন আর মনেই হয়নি। কিন্তু সগুণা? চেনাই যাচ্ছে না, এমনই বিবর্ণ অসুস্থ শরীর দেখলাম। হয় ত ম্যালেরিয়াই ধরেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্র ক্ষীণ অথচ ঔৎসুক্যপূর্ণ স্বরে বল্‌লেন "দিদি এসেছেন?" আমি ঘাড় নাড়তেই বল্লেন, "কই?" আমি হাত দিয়ে সেই ঘরের দিকে দেখিয়ে দিয়ে কাকার বিশ্রামের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পরে তাঁদের আর সাড়া না পেয়ে কি কর্‌ব ভাবছি, ইতোমধ্যে দিদির ডাকে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, দিদি সেই চিরদিনের দিদিমূর্ত্তিতে সগুণার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। সগুণা তাঁর কোলের মধ্যে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছেন। তাঁর মুখ দেখা গেল না—কিন্তু দিদির মুখ দিব্য প্রসন্ন, সেই শ্রীহাসিমুখ। আমায় বল্লেন, "নীরেন—এখন তোমায় এই আদেশ—এই ৫ হাজার টাকা দিয়ে আমাদের যে সব জমী-জমা বাড়ী-ঘর বিক্রী ক'রে ফেলেছি, সে সব আবার যথাযথভাবে কেড়ে নিতে

হবে। যাদের বিক্রী করেছি, তারা ধর্ম্মভীরু লোক, আমার প্রতিবেশীই। সব ফেরত দেবে এখনই! যা হ'য়ে গেল সব 'ছেলেখেলা!' কেবল তোমার টুকুই তোমার উপরি লাভ, বুঝেছ? শ্রীমান্ হরেন আর তুমি তোমাদের কাণ্ড আপনার গায়ে পেতে নিয়ে অনর্থক এই কাণ্ডগুলি মেয়েটি বাধিয়েছেন। (সগুণা যেন এই সময়ে একটু ন'ড়ে উঠলেন।) যাক্, যেমন যা যা গিয়েছিল, দেবতার বরে আবার সব তেম্নই হ'ল—কেবল যার 'হেঁটে কাঁটা ওপোরে কাঁটা' ছিল, তার তাই-ই লাভ হবে! এই হ'ল এই 'ব্রতে'র শেষ কথা। আমি এখন মেয়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে কাকাকে প্রণাম করতে যেতে পারলে বাঁচি।"

তিনি ঘর হ'তে বার হবার আগেই আমি ধীরে ধীরে স'রে এসে একটা বড় জোরে নিশ্বাস ফেলে নিলাম। কিসের জন্য সেটা? আর কিছুরই জন্য ত নয়! দিদির কাছে সগুণা ক্ষমা পেয়েছেন, স্নেহ পেয়েছেন, এই স্বস্তিতেই! প্রণাম—প্রণাম ভগবানকে!

পরদিনই তাঁরা পশ্চিমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দিদি বল্লেন, "গয়নাগুলো দেবে না নাকি নাকু?" অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে বাক্স শুদ্ধ ধ'রে দিয়ে স'রে যাচ্ছি—দেখলাম, দিদির হাত চেপে ধ'রে সগুণা সেগুলো তাঁর গায়ে তখনই পরাবার চেষ্টা হ'তে দিদিকে নিবৃত্ত করল! গাড়ীতে উঠে যখন তাঁরা চ'লে গেলেন, দিদি বল্লেন, "বাক্সটা যে সগুণা নিয়ে গেল না?"

আমি উত্তর দিলাম, "এটা আমারই বাক্স যে।"

"ও-ও" ব'লে দিদি কর্ম্মান্তরে চ'লে গেলেন। আবার একটা নিশ্বাস ফেলে সেই খালি বাক্সটা তুলে নিলাম। আর ত তার মধ্যে আগুনের মত কিছু আমার চোখকে জ্বলিয়ে দেবে না! এইবার নির্ভয়ে এই খালি বাক্সটিকে খুলে দেখি। হাত দিয়ে তার শূন্য স্থানটি স্পর্শ করি। আর ত হাজার কাঁটার মত কিছু হাতে বিঁধবার ভয় নেই!—কিন্তু হ্যাঁ—একটু বিঁধলো যে! কি এ? চকচক করছে ছোট্ট পিনের মত? দেখেছি এটুকুকে তাঁর কাঁধের ওপোরে চিক্ চিক্ করতে! ভুলে গেছেন কি নিতে? দেখতে পাননি? আশ্চর্য্য কি? পাঠিয়ে দিতে হবে এটুকুকে!

না—না—না! দিতে পারব না। দিদির মুখ দিয়েই যে তাঁর সামনে বেরিয়ে গেছে, কাঁটা যার লাভ হবার, তারই তাই হলো! এ তবে আমার—আমার—আমার! ভুলে হোক্, ভ্রান্তিতে হোক্, ব্যস্ততায় হোক্, দিয়ে গেছেন আমাকেই তিনি এই কাঁটাটুকু! এটুকু আমি ছাড়ব না—দেব না তাঁকে ফিরে! এই-ই মাত্র থাকুক আমার—এই তাঁর একটু কিছু! ফুল নয়—অন্য কিছু নয়—কেবল একটু কাঁটা। হোক্ কাঁটা, তবু এই আমার যথেষ্ট—এই প্রচুর! "যেখানে ব্যথা, সেখানে ইহারে নিবিড় করিয়া ধরিব!" এটুকুও ত আমার ছিল না। এই কাঁটার ক্ষত সেও ত তাঁরি দেওয়া—তাঁরি হাতের দান! অন্য কারুকে তিনি কি এতটা দুঃখ দিতে পারতেন? কি বল্লেন দিদি, "সগুণা নিজের গায়ে পেতে নিয়েছিলেন!" জানি না

তাঁর কথার কি অর্থ—তবু আমার যা মনে হ'ল, সেই আমার পক্ষে পরম ও চরম অর্থ তার। হরেন্দ্রর জন্য আমার যা কিছু সহানুভূতি, সব তাঁরই সম্বন্ধ দিয়ে, এ ত সত্য কথাই! এ তিনি বুঝতে পেরেই রাগ ক'রে তাঁর গয়না আমার কাছে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলেন! আজ আবার যে জন্যই হোক্, সেটুকু স্বীকার ক'রেই নিলেন ত! আমার দিদি আমার জন্য যুদ্ধ ক'রেই এটা যে তাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে দিলেন, তা আমি ভুলিনি, এ যে কাঁটা, তা আমার জ্ঞান আছে। তবু হরেন্দ্রর মধ্যস্থতায় আমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্বীকার। হরেন্দ্রকে আমার সাহায্যটুকু নিতে এই নিঃশব্দ অনুমতি এ ত দিয়ে গেলেন শেষে! এই কাঁটাটুকুর সঙ্গেই ত তাঁর এই তীক্ষ্নস্পর্শ, এই-ই থাকুক আমার ব্যথার ওপোর নিবিড়ভাবে। এই আমার যথেষ্ট!

এইবার অনেকটা জয়ী হয়েছিলাম! ঠিক্ দু' বৎসর পরে আবার এ খাতাকে খুলে বসেছি। ভেবেছিলাম, আজ এ'কে শুধু পড়ব, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব—আমার গত জীবনের কাহিনীকে! এই দু' বৎসরের রুদ্ধ কথার ধারা আমার, কিন্তু এ'কে সাম্‌নে খোলা দেখে আর যে লোভ সামলাতে পার্‌ছি না। স্রোতের মত হুড়মুড় ক'রে একেবারে বেরিয়ে যাবার জন্য কি ঠেলাঠেলিই বাধিয়েছে! এত দিন এ দুর্ব্বার বেগ

কোথায় ছিল? কেমন বাঁধা প'ড়েছিল—তারা কাজের প্রবল চাপে। সেই যে তাঁরা চ'লে গেলেন, একটি কাঁটা মাত্র আমার প্রাপ্য নিয়ে সেই যে এ খাতাকে বন্ধ করেছিলাম, সেই খালি বাক্সটার মধ্যে, দু' বৎসর পরে আজ খুল্‌ছি! কেন? কিছু দিন হ'তেই কর্ম্মের বলক্ষয় হয়েছে যেন মনে হচ্ছে। বুঝতে পার্‌ছি—

> সারাদিন অন্ধবেগে করি ছুটাছুটি
> কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মমাঝে, আত্মনাশী মন,
> সায়াহ্নে ধরণী পরে ধীরে পড়ে লুটি
> দিবসের পায়ে তার করি সমাপন
> আত্মবিস্মরণ যজ্ঞ!—

ক্রমে সেই হোমাগ্নি যে চারিদিকে একটা অসহ্য উত্তাপ—একটা বিষম জ্বালার সৃষ্টি ক'রে তুলেছে! কিছু দিন হ'তেই অন্তর আবার যে ডাক্‌ছে,—

> ছেয়ে জীবনের এই জ্বলন্ত আকাশ
> এস বেদনার কালো মেঘের বরণ!
> বহ বহ ব্যথাভরা স্মৃতির বাতাস
> এ মৌন মরণ হ'তে করহ তরণ।
> এস প্রেম, অশ্রুরূপে পড়হ ঝরিয়া,
> এনে দাও বিরহ-কাতর মুগ্ধ হিয়া!

এমনি ক'রেই আজ সেই ব্যথাকে ডাক্‌ছি, আমার জীবনের মেঘকে ডাক্‌ছি! আসুক সে, এসে ভিজিয়ে দিক্ আমায়—কাঁদিয়ে দিক্ একটু। এ শুষ্কতা, এ উগ্রতাপ আর যে সহ্য

হয় না। আবার আমি তেমনই সুখে-দুঃখে দুলি, হাসি-কাঁদি, ব্যথা পাই, ডায়েরী লিখি। আমার নূতন জীবনের এই কাজের হিসাব-নিকাশ আর এই কর্ম্ম-কোলাহল, এ ছাড়াও যে আরও কিছু আমার জীবনের আছে, তা অনুভব করি আবার একবার।

কাকা ভাল আছেন ব'লেই মনে করি, কেন না, তিনি আবার নিজের কাজ-কর্ম্ম দেখছেন শুনি! আমায় চিঠি লিখেছিলেন তিনি অনেক দিন নিয়মিতভাবেই, কিন্তু আমিই এই দুই বৎসরে ধীরে ধীরে সেটা কমিয়ে এনে এখন একেবারে বন্ধ ক'রেই দিয়েছি। ওখানের সঙ্গে যোগ রাখলে কি এত দিন এমন জড়যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যেতে পারতাম? এই ডায়েরী না লিখে থাকতে পারতাম? সকলেই যা সর্ব্বদা ঘটছে, জগতের যা সর্ব্বপুরাতন নীতি,—

"সকলেরি আছে সমাপন!
শুকায় সমুদ্র-জল, গ'লে পড়ে হিমাচল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ,—"

কাকাও তেমনি ধীরে ধীরে চিঠি কমিয়ে এনে শেষে বন্ধ ক'রেও দিয়েছেন কিছুদিন। বাকি সত্যার কথা, তিনি কেমন আছেন, কি করছেন—কি ক'রে জানব? কোন যোগই ত কখনও আমার সঙ্গে তাঁর ছিল না—আজও নেই, এ আর বেশী কথা কি! এই ডায়েরীর কথা, এটা চোখে পড়ায় তাঁর সেই বিরক্তি। রাগ ও অপমান জ্ঞানের সঙ্গেও এ'কে জানার স্মৃতি, বোধ হয়, এও তাঁর মনের কোণের

সে স্থানটুকু হারিয়ে ফেলেছে! কালের করাল কবলে সবই এমনই ক'রে লুপ্ত হয়! লোপ পায় না কেবল—

দিদি আমায় ভোলেননি। মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি পাই। তাঁর চিঠিতেই যা খবর পেয়েছি মাঝে মাঝে। সগুণা না কি তাঁকে নিয়মিতভাবেই চিঠি দিয়ে থাকেন। হরেন্দ্রর খবরও পেয়েছি, সে কৃতকার্য্য হ'য়ে দেশে ফিরে আস্‌ছে, কিন্তু সে ত' প্রায় দু'মাস হ'য়ে গেল, এখনও কি সে আসেনি? এসে ত প্রথমে তাঁদের কাছেই যাবে, বিয়ের দিন-টিন স্থির কর্‌বে, তার পরে দিদির কাছে যেতে এদিকেও ত আস্‌বে? দিদিরও অনেক দিন চিঠি পাইনি! কেন মনের এ ব্যাকুলতা? হয় ত তাঁরা অনেক কালের প্রতীক্ষার পর বাঞ্ছিত দিনকে পেয়ে আর কোন কথা মনে রাখতে পার্‌ছেন না এখন। পরে আমায় খবর দেবেন এক সময়ে। খবরই বা নূতন কি হবে? মনের এ ব্যগ্রতার কোন দরকার নেই ত! সময়মত সব খবর পাবার দাবীই বা তার কেন এখনও?

আশ্চর্য্য! মন কি এই জন্যই দু'বৎসর পরে সে দিন অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল? হরেন্দ্র এসেছে। আমার সঙ্গে আর দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে কর্ম্মস্থানে চ'লে গেল। সগুণাদের কাছেই প্রথমে গিয়েছিল। কি সুন্দর হ'য়েই এসেছে সে। সুস্থ-সবল সফলকাম যুবকের মনের আনন্দ যেন মুখে আর শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমায় ত প্রথম কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে অস্থির ক'রেই তুলেছিল। আমিই যেন তার এ সুখ-সৌভাগ্যের

মূল! পাগল আর কা'কে বলে! কিংবা সে বেচারী কি জান্‌বে! তার সৌভাগ্য যে বিধাতারই দান, আমি তা'কে সাহায্য কর্‌বারও যে একটা যন্ত্র মাত্র! হিংসা কর্‌ছি কি? আশ্চর্য্য কি! কেন না, সঙ্গে সঙ্গেই যে নিজের ভাগ্যফল তুল্‌-দাঁড়িতে উঠে পড়েছে! হরেন্দ্র বল্লে. সগুণা বলেছেন, আগে হরেন্দ্রকে আমার দেনা শোধ কর্‌তে হবে, তার পরে বিবাহ! তার আশা আছে, এক বৎসর কি দেড় বৎসরের মধ্যেই সে সেটা শোধ কর্‌তে পার্‌বে, কিন্তু আমার ঋণ ত সে চিরজীবনেও শোধ কর্‌তে পার্‌বে না—ইত্যাদি। প্রাণপণ চেষ্টায় একবার বল্‌লাম, "এটা যদি তোমার মুখের কথা—ভদ্রতার কৃতজ্ঞতামাত্র না হয়, তা হ'লে ক্রমে ক্রমে দু'চার বছরে শোধ কর্‌লেও ত পারতে! এর জন্য বিয়ে বন্ধ রাখা—"

আমাকে বেশী আর বল্‌তে না দিয়ে সে একেবারে আমার হাত চেপে ধর্‌লে! জানালে, কোন আপত্তি এতে তার ছিল না, কিন্তু সগুণার একেবারে মত নেই। "সংসার পাতলেই অনেক খরচ পড়বে. সহজে এ দেনা শোধ হবে না, এ উচিত নয়—এই সগুণার ধারণা ও আদেশ। কাজেই, ভাই, আমি নিরুপায়, আমায় মাপ্‌ কর্‌তে হবে তোমায়!" প্রফুল্ল হাস্যমুখে বিদায় নিয়ে সে চ'লে গেল, আর আমি? জানি না, এ সংবাদ আমায় কি দিল! নেবেন না, এটুকুও নেবেন না তিনি আমার হাত থেকে, আমার ঋণ শোধ ক'রে তবে তিনি স্বামীর ঘরে যাবেন? শেষ পর্য্যন্তও এতটুকু ক্ষমা, এতটুকু দয়া আমায়

দেওয়া তাঁর সম্ভব হ'ল না! আমার এ উপকার মাথায় নিয়ে তাঁর স্বামীকে তিনি বেশী দিন থাক্‌তেও দেবেন না। বেশ, তাই হোক্।

আরও দেড় বৎসর কি দু'বৎসর (হরেন্দ্র যতই বলুক, এর আগে কখনই শোধ কর্‌তে পার্‌বে না। সগুণা নিশ্চয় তা'কে এ টাকার সুদও দিতে বলেছেন। কেন বল্‌বেন না, এও বলাই সম্ভব ব'লে মনে হয়।) এখনও এই, এত দিনই এই অবস্থায় থাক্‌তে হবে? ওঃ! কিন্তু এ উদ্বেগই বা কেন? এখনই এদের বিয়ে হ'য়ে গেলেই কি এমন শান্তি পেতাম? কেন এ বৃথা আন্দোলন?

কিন্তু ঝড়কে কেন বৃথা আন্দোলন কর্‌ছ ব'লে কেউ থামাতে পেরেছে কখনও?—পার্‌লাম না, তাই পার্‌ছি না!

দিদি চিঠি লিখেছেন। আর হরেন্দ্র তাঁর সেই চিঠি আমার কাছে পৌছে দিয়েই তার কর্ম্মস্থলে দৌড় দিয়েছে। ব'লে গেছে, "ভাই, আমার সময় নেই, তুমি আর দিদি যা পার কর। যা স্থির হবে, জানিও, আমি তার পরে ছুটি নিয়ে সেই রকম কাজ কর্‌ব।" দিদি সগুণার এ হুকুম বরদাস্ত কর্‌তে রাজী নন। বারে বারে এ রকমে সে তাঁদের অপমানই কর্‌ছে, এই তাঁর ধারণা হয়েছে। তিনি আবার আমায় সেই রকমে টাকা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং দিদির মানরক্ষার জন্য আমায় তা নিতে হবে, এই তাঁর আদেশ। তাঁর দুই ভাই-ই এখন কৃতী, পাড়াগাঁয়ের ও সম্পত্তি হরেন্দ্রর এমন কোন কাজেও

লাগবে না, তিনি ও-সব বিক্রী ক'রে হরেনের কাছেই স্বচ্ছন্দে থাক্‌বেন, কিন্তু এমন ক'রে বিয়ের আর দেরী করা কোন মতেই উচিত নয়—তাঁর ধারণা। তিনি সগুণাকেও এ-সব বুঝিয়ে লিখেছেন। সব ঠিক হ'লে টাকা নিয়ে তিনি আমার কাছে আস্‌বেন। আমায় তখন যথোচিত কর্ত্তব্য কর্‌তে হবে।

কি কর্‌তে হবে আরও? সগুণাকে জানাতে হবে, আমি টাকা পেয়েছি, তোমরা অঋণী—এই ত? সে ত সচ্ছন্দেই পারব, কিন্তু দিদির চিঠির ভাবে বোধ হচ্ছে, আরও ঢের কর্ত্তব্য আছে আমার। না—না,—এর বেশী আর পার্‌ব না, জানাবো এ কথা তাঁকে, তিনি যদি বেশী জেদ করেন। তাঁর ত অজানিত কিছু নেই! সেদিন না এই অবস্থায় অনেক দিন থাক্‌তে হবে ভেবে অসহ্য লেগেছিল? এই ত শেষ হ'য়ে এলো সে অবস্থাব —তবে আবার এ হৃৎকম্প কেন? গীতায় পড়েছিলাম—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

এ কি শুধু আত্মার সম্বন্ধেই বলা চলে? কখনই না!

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

এই অবস্থা এই মুমুক্ষুত্বের লক্ষণ আর একটা প্রচণ্ড আসক্তির মধ্যেও যে ফুটে উঠে! একেও যে "আশ্চর্য্যবৎ

পশ্যতি কশ্চিদেনং", কেহ কেহ এ'কে জেনেও আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন। আত্মার মতই যে এরও রূপ। এত দিন যে কোন গুরু দুঃখই বিচলিত করতে পারেনি! আজ এই নানা সংবাদে তার আশ্চর্য্য রূপ নানা ভাবে অনুভব করছি—বিশ্বরূপ-দর্শনের মতই!

দিন দশেক কেটে গেল, আর কোন সাড়া-শব্দই নেই কোন দিকের! মনটা আবার একটু সুস্থির হয়েছে। কাজে মন দিতে পেরেছি আবার।

পরদিন। দিদি এসেছেন তীর্থ-যাত্রায়। সঙ্গীদের সঙ্গে দ্বারকা দর্শনে যাচ্ছেন তিনি। পথে সগুণাদের কাছেও যাবেন। একখানা চিঠি আমায় তিনি ফেলে দিলেন। সগুণার হস্তাক্ষর দেখে সেখানা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে শান্তভাবে বললাম, "যা বলতে চান দিদি, মুখেই বলুন।" দিদি তখন বললেন, তিনি আর একা এমন ভাবে থাকতে পারছেন না। ভাইয়ের সংসারে একটু সুখী হ'তে চান তার বিয়ে দিয়ে। এই কথার উত্তরে সগুণা যা লিখেছেন, পত্রের একটা জায়গা থেকে তাই তিনি পড়তে লাগলেন;—

"আপনার এ কথায় বড় কষ্ট হলো দিদি; যদি মাপ করেন, কিছু মনে না করেন ত বলি, যদি সম্ভব হয়, হরেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত একটি মেয়ে খোঁজ ক'রে তাঁর বিয়ে দেন। আমার রুগ্ন বাপ, তাঁকে সর্ব্বদা আমার দেখতে হয়। আমার ইচ্ছে হয় না যে, এ অবস্থা হ'তে অন্য অবস্থায় পড়ি। বিশেষ, আপনারা যদি

এই রকমে আমাকে আমার মনের ধারণার বিরুদ্ধে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্‌তে বাধ্য করেন, তা হ'লে আপনাদের জানাচ্ছি—আমার বিয়েতেই ইচ্ছা নেই। আপনার সর্ব্বস্ব না নষ্ট ক'রে ধীর ও সঙ্গতভাবে ধার শোধ ক'রে তার পরে আপনারা যা বল্‌বেন, তা'তে আমি আবদ্ধই ছিলাম জানবেন, কিন্তু এর অন্যথায় আমিও আপনাদের কাছে নিজেকে সত্যে মুক্ত মনে কর্‌ছি। হরেন্দ্রবাবুকে এ-কথা জানাবেন।"

দিদির নিঃশব্দ অবস্থা দেখে আমি দিদিকে ভরসা দিতেই বল্‌লাম, "থাক্ দিদি আপনিও আর দুটো বৎসর সহ্য করুন! ধার শোধই আগে হোক্!"

"অগত্যাই। আমি একবার তার সঙ্গে দেখাও কর্‌ব! এ চিঠি হরেনকে পাঠাতে পার্‌ব না, সগুণাকে আগে ঠাণ্ডা করতে হবে। আমি হরেনের অনুমতিতে আবার যে সব বিক্রী করেও ফেলেছি—বারে বারে এ রকম ফেরত নেওয়া আর বিক্রী করা, হ'লই বা তারা সৎলোক—এ যে ভয়ানক অন্যায়। সগুণা যদি এ'তে বেঁকেই বসে একেবারে? যে রকম জেদালো মেয়ে আগাগোড়া তা'কে দেখছি—সবই সম্ভব। আমার কাজে হরেনকে পাছে কষ্ট পেতে হয়, আমার এই ভয় হচ্ছে নীরেন।"

"তা হ'লে এক কাজ করুন দিদি, আমি আপনাদের এখনই এ টাকা চেয়ে একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি। তাই আপনি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। তিনি বুঝুন,

উপায়ান্তর না দেখেই আপনারা এ ভাবে আমার ঋণ শোধ কর্‌ছেন।"

দিদি বিষাদ-ভরা চোখে আমার পানে চেয়ে বল্‌লেন, "দিদির জন্যও কিছু প্রাপ্তি হবে দেখছি তোমার। বেশ, তাই দাও!—নইলে ভাই বলেছি কেন?"

এক মাস পরে। ফিরে এসেছেন দিদি তীর্থ সেরে, আর তাঁর এই অযোগ্য ভাইকে দেখা না দিয়েও যাননি। আমি সাহস ক'রে সগুণার সংবাদ কিছু নিতে যাইনি, ভয় লাগে, পাছে আবার মনে বিক্ষেপ ওঠে! এইখানে এই রকমে মনের স্থিতিকেন্দ্র স্থির রাখতে পার্‌লে আর 'ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে!' নিজেকে বাঁচাবার জন্যই যে এটুকুর দরকার। কিন্তু দিদি সেটুকু না শুনিয়ে ত গেলেন না। দুঃখের হাসি হেসে বল্‌লেন, "সে কি সে রকম বোকা মেয়ে ভাই? তোমার চিঠিখানা দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে, 'এ সব সাজানো কাণ্ড আপনাদের। আমি যদি দু'বছর পরেই বিয়ে করি, তা'তে আপনাদের কি ক্ষতি হ'ত? হরেনবাবু ত প্রথমে রাজি হয়েছিলেন, আপনাদেরই কেন এ জুলুম?' আমি একটু পরে তা'কে বল্‌লাম, 'কিন্তু হরেন আমায় কি চিঠি লিখেছেন দেখ!' আমিও সগুণাদের ঠিকানায় হরেনের চিঠি পেয়ে এসেছি সে লিখেছিল—'এখন আর উপায় নেই। বারে বারে এ রকম কাণ্ড উচিত নয়। সম্পত্তি বিক্রীর ঐ টাকাই নীরেন্দ্রকে নিতে হবে। সগুণা অন্যায় জেদ ধরেন, অনুপায়! তিনি দু'বৎসর

পরে বিয়ের কথা এখনও বলেন, তা'তে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সম্পত্তি ফেরাফিরি আর চল্‌বে না'।"

আমি এ কথার জের আর না বাড়াতে ইচ্ছে ক'রে দিদিকে বল্‌লাম, "আপনি কি এখন দু'দিন এ ভায়ের কাছে থাক্‌বেন দিদি?"

"থাকৃতে ইচ্ছে ত করে, কিন্তু হরেন বাসার বন্দোবস্ত সব ঠিক করেছে। দেনা যখন তার শোধ হ'য়ে গেল, তখন একা কষ্ট ক'রে সে আর থাকৃতে রাজী নয়। তুমি আমায় তার কাছে পৌছে দিয়ে আস্‌বে?"

"আমি?"

"হাঁা,—তা'তে তোমার কিছু আপত্তি আছে ভাই?"

আপত্তি ছিল বৈ কি, কিন্তু কথা বল্‌তে গেলেই কেমন সব বিশ্রী লাগে! বাক্যব্যয় আর না ক'রে তাঁকে পৌছেই দিয়ে এলাম হরেনের কাছে। হরেনকে ত কিছুমাত্র অনুৎসাহ দেখলাম না। দিদি আমায় কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর মুখেই শুনলাম, সগুণা খুবই অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছেন। বলেছেন, তিনি আর বিয়ের মধ্যে বাধ্য নন! হরেনের জেদে তাঁর জেদ আরও বেড়ে গেছে! হরেন কিন্তু দিব্য অম্লানমুখে একটু হাসির সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ করলে, "সগুণা বরাবরই যে খুব জেদী, তা দেখতেই পাচ্ছ, তবে আমিও কম যাই না। দিন কতক কাটুক, তার পর আশা করি, এ রাগ প'ড়ে যাবে। এর জন্য ভাবনার এমন কিছু নেই।" তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে,

"তুমি কেন অমন বিষণ্ণভাবে আছ শুনি? ভাবছ বোধ হয় যে, এমন জান্‌লে কে এদের সঙ্গে আলাপ করত,—না? কি করবে, রাগীদের পাল্লায় পড়েছ যখন, উপকার ক'রে তার বদলে এটুকু নিতেই হবে। কিচ্ছু ভেব না হে—সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে কিছুদিন পরেই। মাঝে হ'তে দেনাটা শোধ হ'য়ে আমার গা-টা একটু খোলসা হ'ল—দিদিকে কাছে আন্‌তে পারলাম। বিলেতে কষ্ট ক'রে থেকে থেকে হয়রাণ হ'য়ে আছি, এখন একটু আরামও ত দরকার! কিছু টাকাও হাতে জমুক—বিয়ের জন্য তাড়া কি?" আমি মনে মনে একটু অবাক্ হ'য়েই তার পানে চাইছিলাম; একবার মাত্র প্রশ্ন করলাম, "কাকা কিছু বলেননি?"

"না,—তিনি মেয়েকে এ বিষয়ে একেবারে স্বাধীনতা দিয়েছেন শুনলাম—দিদির মুখে! তা আর দেবেন না—মেয়ে যে তাঁকেও একবার হয়রাণ করেছিলেন। আমার উপরে বেশী প্রসন্ন ব'লেও মনে হয় নি! যা কথাবার্ত্তা ক'য়েছিলেন, খুবই সংক্ষিপ্ত, কি আমরা স্থির করছি এইটুকুমাত্র—সেটুকু শোনার পর আর বাঙ্-নিষ্পত্তি করেন নি।"

যাক্, দিদিকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে চ'লে এলাম। হরেনকে যতটা নিশ্চিন্ত দেখলাম তাঁকে ততটা ব'লে বোধ হ'ল না। কিন্তু আমায় সে চিন্তার কোনও অংশ দিলেন না। তবে আমারইবা কেন আর অনর্থক সে জন্য ব্যস্ত হওয়া? সগুণার প্রকৃতির যে রকম পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা'তে দু'বৎসরের

মধ্যে তিনি নত না হওয়াই সম্ভব! তার পরেই বিবাহের নিমন্ত্রণ পাওয়া যাবে দিদি ও হরেন্দ্রর নিকট হ'তে না হয়!

অগ্রহায়ণ। ক'টা মাসই কেটে গেছে। সকলের সঙ্গেই সব রকম আদান-প্রদান বন্ধ, দিদি পর্য্যন্ত আর কৈ চিঠি ত লেখেন না! কেউ কোথাও নেই, কিছুই বল্‌বার নেই, ভাববার নেই! এ চর্ব্বিত-চর্ব্বণই বা আর কেন, কেন এ'কে মাঝে মাঝে বা'র ক'রে পড়ি—লিখছিই বা কেন আজ আবার? কান-কন্দ ছাড়া আর ত এর সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমার নেই! ছিঁড়ব কি? ছিঁড়ে ফেলি না খাতাখানাকে? না—না—না! এইটি কেবল পার্‌ব না।

মাঘ। দিদির চিঠি। আবার সেই আন্দোলন—সেই ধাক্কা।

"ভাই, হরেনের কাছে যে আমি সগুণার ব্যবহারে কি লজ্জায় পড়ছি, তার কি বল্‌ব! যদিও হরেন বলে, আমার এ মনস্তাপের কোনই কারণ নেই, তবু মন ত মানে না। হরেন আর এ রকম ভাবে বেশী দিন থাক্‌তে রাজী নয়। সে এখন বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছুক। বড়দিনের ছুটীতে সে সগুণাদের ওখানে গিয়েছিল। মেয়ের ব্যাপার ত কিছু বুঝছি না! হরেনকে বলেছে, 'বিয়ে কর্‌তেই তার ইচ্ছে নেই। সে বাপের কাছেই চিরদিন থাক্‌তে চায়। হরেন্দ্র যেন তার আশায় আর না ব'সে থাকে! ভাল মেয়ে দেখে সে যেন বিয়ে ক'রে সুখী হয়।' এ কি কাণ্ড! আমি ত বলেছিলাম একবার ভাই, ও মেয়েকে

আমরা কেউ-ই বুঝতে পারছি না! না হয় তার অমতে আমরা একটা কাযই করেছি, সে রাগ কি আর পড়ে না? তাই বা এমন কি কায? এ ত লোকে ক'রেই থাকে! সে-ই বা কেন তবে তার নিজের গয়না তোমার কাছে বন্ধক রেখেছিল? আমাদের কি তা'তে অপমান হয়নি? তারই অনুরোধে সেবার আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য উল্টে দিয়েছিলাম।

বার বার কি সে কায করা যায়? আমরাও ত একটা মানুষ। এই অপরাধে আর সে হরেনকে বিয়েই করবে না! এখন তোমার টাকা এমন ক'রে দু'তিন বছর ফেলে রাখতে তার লজ্জা হচ্ছে না—তখনই যত হয়েছিল! সবই কি তার জেদ আর খেয়াল মাত্র? হরেনের জন্য বাপের সংস্রব ত্যাগ, তার পরে যত যা সবই কি তাই? হরেন যা বল্‌ছে, তাই কি তবে ঠিক? বিয়ে ভাঙ্গার জন্য তার এ একটা ছুতো মাত্র? আসলে তার বিয়েতেই ইচ্ছে নেই। কি জানি! তবু হরেনকে বল্‌ছি, সে দু'বছর বলেছিল, তাই না হয় দেখ, কিন্তু হরেন বড্ড রেগেছে। বল্‌ছে, বেশী দিন সে তার এ জেদ্ আর সহ্য করবে না, জানি না কি হবে। আমি কি যাব ভাই তা'কে একবার বোঝাতে? নিয়ে যেতে পারবে তুমি?"

উত্তর দিলাম, "আমায় আর জড়াবেন না দি[illegible], যা ভাল বোঝেন, করুন।"

পারি না—পারি না আর এ সব শুনতে, ভাবতে, এই সবের ধাক্কা সইতে।

বৈশাখ। বুঝতে পারছি, এ ব্যাপারের উপসংহার একটা কিছু না হ'লে আর আমি এই ডায়েরী লেখাকে ছাড়তে পারব না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গেলেও হঠাৎ এক দিন এ'কে খুলে বসা আমার অনিবার্য্যই হ'য়ে দাঁড়ালো।—বিশেষ কোন একটা খবর পেলে! হরেন রাগে কি লজ্জায় কিসে আমায় চিঠি দেয় না জানিনা,—দিদির চিঠি মাঝে মাঝে পাই। তিনি লিখেছেন, গরম সামনে ব'লে সগুণারা এবারও দেশে ফিরেছেন। গ্রীষ্মটা বাঙ্গলাতেই কাটাবেন। এবার আর কাকা আমাকে এ সংবাদ দেননি। এইখান দিয়েই গিয়েছেন তাঁরা—তবুও—যাক্, সে ভালই করেছেন!

১লা জ্যৈষ্ঠ। দিদির চিঠি—

"স্নেহাস্পদ ভাই নীরেন, না জানি কত বিরক্তই হও যে, দিদির সব কথা আমাকেই বা লেখা কেন? কিন্তু যত দিন থেকে এই ভাইটিকে পেয়েছি, ততদিন নিজের সব-কিছুই তা'কে জানানো একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে যে আমার। হরেনের প্রায় অমতের মধ্যেই আমি সগুণার আর কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কাকার শরীরটা সত্যই আবার খারাপ দেখলাম, মেয়েও তাই; কিন্তু তার বিয়ের ইচ্ছে নেই, এ কথা সত্যই! জেদ মাত্র নয়, এটা বেশ বোঝা গেল। রায়-সাহেব যে তাঁর এক সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে হরেনের ওপর ক্রমে লেলিয়ে দিচ্ছেন, এ গল্পটাও করলাম। এমন মন দিয়ে

গল্পগুলো শুনলে—আর তার পর থেকেই এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য সুস্থতার আভাস তার মুখে চোখে ভেসে উঠতে লাগল যে, সে চাপতে চেষ্টা করলেও তা বেরিয়ে পড়ছিলো। আমি বল্লাম, 'আমরা দু'বছরই প্রতীক্ষায় রইলাম জেনো।' এই কথাটার পর কি বলব ভাই—একেবারে আমার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে (আমি ধ'রে না ফেললে পায়েই হাত দিত।) কি বললে জান? 'আমায় মাপ করুন দিদি! আপনি ত একা হরেন বাবুরই দিদি নন—আমারও যে দিদি। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই। আপনি বলুন আপনার ভাইকে—আমায় তিনিও মাপ করুন।' এ ত জেদের কথা নয় নীরেন, রাগও নয়। নিতান্তই অনিচ্ছা। হরেনকে আর ত না ব'লে থাকা উচিত নয়। এরা শিক্ষিত মেয়ে, অনায়াসে বিয়েটাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিন কাটাতে পারবে; কিন্তু আমার ভাইয়ের তাই ব'লে সংসার হবে না? সে ত তা চায়। বোধ হয়—বোধ হয়, এই রায়-সাহেবের মেয়েই শেষে আমাদের ঘরে আসবে। হোক, মেয়েটি মন্দ নয়। আর যেমনই হোক, হরেনকে সুখী করতে পারলেই হ'ল। সগুণার এ ব্যবহারে হরেন না জানি কতটা আঘাত পাবে, কি যে হবে, জানি না। তুমিও এর থেকে অনেকটা দুঃখ যে নেবে, তা জানি, তেমনই জেনো, তোমারও অংশী আছে। আমিও সময়ে সময়ে এ ব্যাপারে নিজেকে অনেকটা কারণ ভাবি,—কিন্তু সত্যই কি আমরা তাই?

আশীর্ব্বাদ জেনো—আশা করি, ভাল আছ। আবার পত্র দেব শিগ্‌গির। উত্তর দেবে ত? ইতি—

তোমার দিদি।"

উত্তর কি দেব? আছে কি কিছু? না।

প্রায় পনেরো দিন পরে—আবার দিদির চিঠি।

"কৈ চিঠি ত দিলে না, জানি না তুমিই বা কেমন আছ? যে সব খবর দিচ্ছি, আবারও দেব বলেছিলাম। হরেন এক সপ্তাহের ছুটী নিয়ে সগুণাদের বাড়ী গিয়েছিল, তাই তার শেষ ফল জান্‌বার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম। হরেন সপ্তাহখানেক ফিরে এসেছে। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, সেও বলেনি, কিন্তু তার দুদিন এক একবার খুব বিরক্ত বিরক্ত ভাব, আবার এক একবার তাকে খুব বিষণ্ণও লাগছিল—তাই মনে হয়, খবর একই। যা হোক, এখন আবার হরেন খেলাধূলো করছে, রায়-সাহেবের বাড়ী যাচ্ছে, তাঁরাও আস্‌ছেন, দেখে এক রকম যেন বুঝছি। সত্যই সগুণা তবে আমাদের হ'ল না। মেয়েটিকে যে কতখানি ভালবেসেছিলাম, এখন বুঝছি। যাক্—হরেন সুখী হোক—সেও যাতে ভাল থাকে, করুক। কি জানি, মেয়েটার জন্য একটু ভাবনা হয়, এত খেয়ালি স্বভাব যদি হয় তার, জীবনে সুখী হ'তে পারবে ত?"

১লা আষাঢ়। এ কি? বিশ্বাস করতে পারছি না যে। একসঙ্গে দিদির আর হরেনের চিঠি। রায়-সাহেবের মেয়ে স্নেহলতার সঙ্গে হরেনের বিয়ে। আমি যেন শীঘ্র তাঁদের

কাছে যাই—নৈলে তাঁদের আর ত কেউ নেই। কি হ'ল এ! এ কি হচ্চে! সগুণা কি সত্যই এতখানি হ'তে দিলেন? ভুল করলেন না ত? হরেনের কথা ধরি না, তার প্রকৃতিতে এটা খুবই সম্ভব। রাগের মাথায়—সগুণাকে উপেক্ষা দেখাবার জন্যই বোধ হয়, এত শীঘ্র সে এ কায করলে? তার জন্যে তত ভাবি না, সে এ রাগটা ভুলে গেলেই সুখী হবে এবং ভুলতেও বোধ হয় বেশী দিন লাগবে না! কিন্তু সগুণা? তাঁর তো কোন কষ্ট পেতে হবে না এ জন্য? জানি না। যেতে পারব না এ বিয়েয়! এর জন্য মাপ চাইলেই হবে তাঁদের কাছে। অসম্ভবই যে!—অন্তর যে ভয়ে কাঁপছে! সগুণা এ কি করলেন? এও এক পরম আশ্চর্য্যই বটে! তাঁরা করতে পারলেন, আর ভয়ে কাঁপছি আমি! এ আমি কে তাদের ভুলের, সত্যের বা মিথ্যার মাঝখানের? কেউ না।

১৫ই আষাঢ়। দিদির খুব দুঃখ হয়েছে যাইনি ব'লে। হরেন্দ্র বিয়ে হওয়ার খবর দিয়েছে। হরেন লিখেছে—"জীবন-পথে এত মানসিক দৌর্ব্বল্যের স্থান নেই। জগতে নিজের প্রাপ্য আদায় ক'রে নিতেই হবে! জীবন একটি খেয়াল নয়! তুমি এলে না কেন? স্নেহলতাকে দেখে সুখী হ'তে দিদির বেশ পছন্দ হয়েছে স্নেহকে।"

প্রার্থনা করছি, তোমরা সুখী হও! খেয়াল? তাই যদি হয়, এই জগৎটাই না কি এক জনের খেয়ালে তৈরী! এর সুখ-দুঃখ বিধি-নিয়ম না কি তিনি ইচ্ছা করলে অন্য

রকম করতেও পারেন শুনি, কিন্তু কই, তিনি ত তাঁর এ খেয়াল ছাড়েন না! এর জন্য সন্দেহও আসে যে, বোধ হয়, তিনি তা পারেনই না! যে চাকা তিনি নিজেই একবার ঘুরিয়ে ছেড়ে দেন, তা'কে আবার তার সে গতি ফিরিয়ে অন্যভাবে চালাতে, জানি না, তিনি এ 'অন্যথা' করতে শক্তিই রাখেন কি না, কিন্তু কই তা ত করতে দেখা যায় না! তাঁর সেই প্রথম খেয়ালে সেই অনাদি নিয়মেই ত জগৎ একই ভাবে চলেছে! সেই খেয়ালের এতই জোর!

শ্রাবণ। বৌ দেখে এলাম হরেনের, আর খুব বকুনিও খেয়ে এলাম। দিদি কিন্তু একটুও বকেননি! মেয়েটি সত্যই ভাল, মুখশ্রীতেই কেমন একটু শান্ত-সুন্দর ভাব! সব চেয়ে বড় কথা, হরেনকে সত্যই সুখী বোধ হ'ল! দিদি কিন্তু কেন একটু বিষণ্নমত? ভাজটি ত অপছন্দ নয়! বৌ দেখতে যা তা নিয়ে গিয়েছিলাম, তার চেয়ে আরও একটু বেশী দামী জিনিষ দিতে ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সঙ্কোচ কাটাতে পারিনি! এ'তেই হরেন হেসে বল্লে, "জহরলাল-পান্নালালের দোকানটাই উঠিয়ে আনতে পারনি?" লজ্জা করল, কিন্তু স্নেহ মেয়েটি যখন প্রফুল্ল মুখে "এমন সুন্দর সুন্দর গড়ন আর দেখিনি" ব'লে আমার সে লজ্জাটুকু ধুয়ে দিলে, তখন মেয়েটিকে আমি অন্তর হ'তেই আশীর্বাদ করলাম।

আশ্বিন। হরেনরা পূজোর ছুটীতে বেড়াতে গেল আমার এইখান দিয়েই। দিদি যাননি। তাঁর পত্রে জেনেছি, তিনি সগুণার নিমন্ত্রণে তাঁদের গ্রামে গেছেন। হরেনদের বেড়াবার

সময়টা তিনি সেইখানেই কাটাবেন। আমি পাছে দুঃখ করি, সে জন্য লিখেছেন, "সগুণা হরেনের বৌ দেখ্‌বার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছিল, আমি তা'কে এখনই এতটা বাড়াবাড়ি কর্‌তে নিষেধ কর্‌লাম! আরও কিছু দিন যাক্‌। হরেন এ কথা শুনে একটু ভুরু কুঁচ্‌কেছিল। তার মনে এখনও একটু রাগ থাকা সম্ভব বৈ কি। আমার সঙ্গে সগুণা 'দিদি' সম্পর্কটা আরও ঘনিয়ে তুল্‌ছে। কাকার না কি জ্বর হচ্চে মাঝে মাঝে, তবু তিনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। সারা বর্ষাটা ঐখানেই কাটালেন, শীতটাও কাটানোর মতলব, কিন্তু শরীর ভাল নয়, অরুচিতে কিছু খেতে পারেন না! আমার হাতের রান্না ঝোলের কথা না কি মাঝে মাঝে বলেন, তাই না গিয়ে কি ক'রে থাকি? বুড়ো মানুষ, তা'তে আমাদের ওপোর কতখানি ভালবাসা ছিল, তা ত জানই। অভিমানেই আর কিছু বলেন না (এইখানটা পড়্‌তে পড়্‌তে আমার মত অকৃতজ্ঞেরও চোখে জল এসেছিল খানিক), বিশেষ হরেন আর বৌ এ সময়টা বেড়াতে যাবে। হাজার হোক্‌, এরা একটু বয়স-পাওয়া, আর অন্য রুচির মধ্যে মানুষ হওয়া মেয়ে, দুজনে ডাকাডাকি সাধাসাধি কর্‌লেও আমি আর সঙ্গে গেলাম না। দুজনেই বেড়িয়ে আসুক! আমি সে ক'টা দিন কাকাকে দেখে আসি। তুমি যাবে না কি একবার?"

কি যে বলেন দিদি! আমি যাব? এ কি পারি? কি মনে কর্‌বেন?

১২ই আশ্বিন। যেতেই যে হ'ল, কাকা খুবই অসুস্থ। দিদির চিঠির মধ্যে সগুণারও আহ্বান—"দয়া ক'রে এসে আমাদের কল্‌কাতা নিয়ে চলুন, বাবার অসুখে বড় ভয় পাচ্চি।"

১৫ই আশ্বিন। আলাদা বাসা ঠিক ক'রে রেখেই আনতে গিয়েছিলাম তাঁদের, কিন্তু দিদি সে কথা মুখে আনতেই দিলেন না কাকুকে। সগুণা দুতিনবারই সে বাসায় যাবার জন্য মিনতি করলেন তাঁকে, কিন্তু দিদির একই কথা—'সে অসম্ভব! আমি তা হ'লে সেরে উঠ্‌ব না।' সত্যই কাকার অসুখ খুব বেশী রকমই দেখছি। চিরদিন যাঁর পশ্চিমে থাকা অভ্যাস, এই বর্ষায় তিনি বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে একেবারে ম্যালেরিয়ার কোলের মধ্যে থেকে বড়ই ভুল করেছেন। সেবারের অসুখ হ'তে স্বাস্থ্যটা তাঁর খারাপ হয়েইছিল শুনেছি। এ ধাক্কাটা কতদূর যে কি করবে, জানি না।

কার্ত্তিক। ভগবানকে ধন্যবাদ—সাম্‌লে উঠেছেন কাকা। খুব ভয়ই পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে হরেনরাও এইখানে এসে উঠে কর্ম্মস্থানে গেল, দিদির যাওয়া হ'ল না। তাঁর হাতেই কাকার শুশ্রূষার বেশী ভাগ রয়েছে দেখে হরেনই বল্‌লে, 'আপনি একটু সেরে উঠ্‌লে তবে দিদি আমার কাছে যাবেন।' স্নেহকে সগুণা খুবই পছন্দ করলেন দেখলাম। দামী কি গহনা কাপড় এই সব যৌতুক দিলেন। হরেন প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে না পারলেও তিনি বেশ সহজ মুখেই তার সঙ্গে আলাপ ক'রে হরেনের সে ভাবটা কাটিয়ে দিলেন দেখলাম।

এই সময়টা আমি আড়ষ্ট হ'য়েই তিন জনের দিকে [illegible] এই সংঘর্ষণে তাঁদের মনের মধ্যে না জানি কি [illegible] আমার ভেতরেই যেন তার সব ধাক্কাগুলো এসে লাগছিলো। কিন্তু তাঁদের বিশেষ ভাবান্তর ত দেখলাম না!

আর একটু সুস্থ হ'লেই তাঁদের পশ্চিমে রেখে আসতে হবে কথা হচ্চে, দিদিও তখন তাঁর ভাইয়ের কাছে চ'লে যাবেন।

সগুণা যাবার জন্ম তাগিদ দিচ্চেন বাপকে, তিনি মেয়ের তাগিদে একটু বিপন্নভাবেই দিদির দিকে চাইলেন। দিদি বল্লেন, 'এখনও এক সপ্তাহ হ'তে পারে না।' সগুণা তাঁদের সাহস দিচ্চেন, সে দিকের বাতাসেই তিনি অনেকটা সুস্থ হ'য়ে যাবেন, এখন স্বচ্ছন্দে বেরুনো যেতে পারে।

তাঁর এ তাগিদ্, এ ত খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার। এত দিন যে থাকতে পেরেছেন, এই আশ্চর্য্য। একটা কথা তাঁকে আমার যে বল্‌বার আছে। সেই কাঁটাটি, কেন রেখেছি তা'কে, ফিরিয়ে দিতেই হবে। কি অধিকারে তা'কে আমি রাখি?

একটা ঘরে একা ব'সেই সগুণা কি করছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এমন ভাবে চম্‌কে উঠ্‌লেন যে, ভারি অপ্রস্তুত বোধ হ'ল। খানিক স'রে এসে 'একটা কথা আছে, আমায় মাপ্ করবেন' এই শব্দটুকু অতিকষ্টেই গলা দিয়ে বার্ করতে পেরেছিলাম। তিনি মাথাটা নীচু ক'রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন বোধ হয়। মুখের দিকে চাইতে পারিনি আর, কেবল একখানা হাত যা আমার চোখের দৃষ্টির সাম্‌নেই ছিল,

... ধ'রে দেখছি—কেউ কি মাথা

জানি আমি কর ... নষ্ট দাগ? এ গন্ধ

এমন ধারণাও তাঁর হ'তে পেরেছে ... দি কি

আর দেরী অনুচিত বুঝে বিনা আড়ম্বরে ...
সামনে রাখতেই আবার তিনি চমকে আমার পানে চাইলেন।
মুখখানা কি রাঙা! কোন রকমে ব'লে দিলাম, "সেই বাক্সটার ভেতর প'ড়ে ছিল।" একটুও আর দেরী না ক'রে বেরিয়ে আসছি, ঠিক শুনলাম, অস্পষ্টস্বরে তিনি যেন কি বলছেন। আমি থেমে যেতেই তিনি অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ালেন, সেই নিমিষের মধ্যেই দেখলাম কি সাদা মুখ! সে রাঙার একটুও ত নেই। আর কথা কইলেন না যখন, তখন ত দাঁড়ানোও চলে না আর! নিঃশব্দে চ'লে এসেছি।

বুঝতে পারছি, এইবার এ ডায়েরী লেখা শেষ হ'য়ে আসছে। আর ত পারব না এ'কে ছুঁতে। কাল ওঁদের ট্রেণে তুলে দিয়ে দিদিকে হরেনের কাছে পৌঁছে দিয়ে কিছু একটা করতেই হবে। কি করতে হবে, তা জানি না, তবু কিছু একটা। কিন্তু সেই কিছুটাই কি? জানি না, তা জানি না, জানি না, কেন এবারে এমন রিক্ততা—এমন শূন্যতা আমায় জড়িয়ে ধরলো! ভয় করছে! কৈ, আমার সে স্থিতিকেন্দ্র—যেখানে দাঁড়িয়ে আমি সবকেই ঠেলে দিয়েছি এত দিন, আজ যে কোথাও কিছু নেই দেখছি! কেন এমন হচ্ছে, এখনও যে অনেক কাজ, অনেক কিছু করতে হবে! ওঁদের যাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য

এখনই উঠ্‌তে হবে। এ খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আরও এই ভাব চেপে বসবে, উঠে পড়ি। তাই ত বল্‌ছি যে, ডায়েরী, এইবার বুঝি তোমার শেষ!—এ কি! কি এ! সেই কাঁটাটি! কে তোমার এইখানে তা'কে গেঁথে রেখে গিয়েছে? একেবারে তোমার এইখানে—এই কথাশেষের পরেই? তোমার বুকের ওপোরেই একেবারে?—

রাত্রি হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যায় ওঁদের যাবার সব ঠিক ক'রে এসে নিজের ঘরে ঢুকেই টেবিলের ওপোর এসে এ'কে খোলা আর এই অবস্থায় দেখে নিয়ে বসেছি, আর এখন কত রাত্রি, জানি না! কে যেন ডেকেছিল আমায় যাবার জন্য। দিদি বোধ হয়? কি উত্তর দিয়েছি, জানি না।

এটি কি আমায় দিয়ে যাচ্চেন তবে? ফুল নয়, অন্য কিছু নয়, এটি একটি কাঁটামাত্রই ত! তাই কি এটুকু আর ফিরে নিতে চাইলেন না? এই কাঁটার সম্বন্ধটুকু স্বীকার করলেন তবে? কিন্তু আজ যে মনে হচ্চে, কি করব এ'কেও নিয়ে আমি? এই ত এত দিন এ ছিল আমারই কাছে। তবে চুরি করা ধন ছিল, আজ ভিক্ষার রূপে এসেছে সে! কিছু দিন আগে হ'লে এ সুখে পাগলই হ'য়ে উঠতাম বুঝি, কিন্তু আজ? আজ ত আমার এ শূন্যতা—আচ্ছা, লেখাগুলো এমন [illegible] সে যাচ্ছে কেন? এ জায়গাটায় এতটা তেল কিসের? এ খাতা ত এই বাক্সতেই থাকে, তেলের সম্পর্ক একেবারে অসম্ভব? কি এ? সুগন্ধি তেলের গন্ধ। কোথা হ'তে এল? ছাপ ছাপ

দাগ দাগ। আলোয় তুলে ধ'রে দেখছি—কেউ কি মাথা রেখেছিল এর ওপর? এ কি চুলের তেলেরই দাগ? এ গন্ধ এ চুলের—তেলের গন্ধ! কি লিখছি—কি বল্‌ছি—আমি কি পাগল হ'য়ে গেলাম আজ? হ্যাঁ, পাগল, তা'তে সন্দেহ নেই; কিন্তু ঠিক্ ঠিক্ সেই তেলের গন্ধ—তাঁরই চুলের।

* * * *

দেহ-মনের সে নিশ্চেষ্টতা এখনও যায় নি, তবু এ'কে শেষ কর্‌তেই হবে যে! দিদি এসে তাড়া দিয়ে যখন আমায় চেয়ার হ'তে টেনে তোলালেন, তখন একেবারে ভোর। কানে তাঁর তীক্ষ্নস্বর প্রবেশ কর্‌লো—"সমস্ত রাত তুমিও এমন ক'রেই কাটিয়েছ? চোখ দুটো এখনও একেবারে রাঙা! বেশ, এখন ওঁদের যাবার উদ্যোগ কর্‌তে হবে না? সাড়ে ন'টায় ট্রেণ না?"

মুহূর্ত্তে সব স্বপ্ন যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো। কি হ'য়েছিল আমার? উঠে পড়লাম; দিদির মুখে একটু হাসি! তীক্ষ্ন চোখে তিনি খাতাখানির দিকে চেয়ে রইলেন। সেটার খোলা পাতার ওপোর মাথা দিয়েই বুঝি ঘুমিয়েছিলাম? লজ্জায় তাঁর সামনে তা'কে আর ছুঁতেও পারিনি, ছুটে স্নানের ঘরে ঢুকে গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে কাকার ঘরে যাবার বারান্দায় যেতেই দেখি, একটা ঘরের দুয়োরের কাছে সগুণা আর দিদি দাঁড়িয়ে। সগুণা একেবারে তাঁর বুকের ওপোরই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কাঁধের

ওপোর মুখ গুঁজে কি যেন বল্‌ছেন। কেবল অশমিত নিশ্বাসের সঙ্গে রুদ্ধ-স্বরের একটা 'না না' শব্দই আমার কানে এল। আমি পিছিয়ে আস্‌তেই দিদি ডাকলেন, "ত্যাখ ত নীরেন, মেয়ের কি দুষ্টুমি? তোমার লেখা এই গল্পটি আমি এ'কে উপহার দিচ্ছি, তা মেয়ে কিছুতেই নেবে না। এ কি আমার অনধিকারের কায? বল ত ভাই! আমি কি তোমার দিদি নই?"

সত্যই আমার ডায়েরী তাঁর হাতে! পালিয়ে যেতে চেয়েছি, পারিনি। কাঠের মত দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েই রইলাম।

একটু পরে আবার দিদি সহাস্য কণ্ঠস্বরে "আচ্ছা থাক্‌, এবারটা ফিরিয়েই দিচ্ছি! আরও খানিকটা বাড়ুক গল্পটা,—কেমন? ভয় নেই, অত আড়ষ্ট হ'তে হবে না। আমি কি একা নীরেনেরই দিদি? তোমারও নই? কাল্‌কের কথা কিছু বল্‌ব না। কিন্তু শুধু কাঁটা নয় এবারে—আর একটু কিছু দিয়ে দে এ খাতাটাকে, লুকিয়ে নয় প্রকাশ্যে এবার! হাঁ, এইটাই বেশ হবে!" বলার সঙ্গে সঙ্গে দিদি সগুণার গলা থেকে সরু একটা হার টেনে তুলে নিয়ে ডায়েরীতে জড়িয়ে দিলেন। তার পরে আমার দিকে সেটাকে বাড়িয়ে দিয়ে, সস্নেহ হাস্যে বল্‌লেন, "এই নাও নীরু, আরও খানিকটা বাড়াও এ'কে—কিন্তু খবরদার, মিথ্যে কথা লিখো না! সগুণা কাল আমায় বলেছে—আচ্ছা থাক থাক।" সগুণা তাঁর গলা ছেড়ে দিয়ে সবেগে ঘরের ভিতরে চ'লে গেলেন। স্নেহদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে দিদি বল্‌লেন "লজ্জাটা আমাকেই ভেঙে দিতে হচ্ছে তোমাদের।

কাল রাত্রিতে তুমি কি কাণ্ডই না করেছ? খেতে ডাকি, কি যে উত্তর দাও, দেখি—সামনে এই খাতা। চোখ দুটো যেন পাগলের মত। তখন মেয়েটাকে গিয়ে একেবারে সটে পটে ধরলাম, কিছু করেছে নিশ্চয়ই আবার সে, যাক্। 'এমনই ক'রে তোমায় মেরেই ফেলবে ব'লে না কি' ব'লে চোখ রাঙাতেই সব কথা ব'লে ফেললে। মেয়ের যে কান্না—সমস্ত রাত থামাতে পারি না। 'উনি অত মিথ্যে কথা লেখেন কেন?' ঠিক্ যেন একেবারে ছেলেমানুষ। কে বল্‌বে, অতখানি লেখাপড়া-জানা সেই জেদী তেজী মেয়ে সগুণাই এই মেয়ে? এখন সব বুঝতে পার্‌ছি নীরেন! তোমার এই ডায়েরাই তার কাল হয়েছিল। না, শুধু হয় ত তাও না—তার আগের সূত্রও ছিল বুঝি কিছু। তোমার সমস্ত ঘটনা জড়িয়েই বোধ হয় এ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। হরেনের সঙ্গে তার কথার দাম রাখা—আর জেদ বজায় রাখার সম্পর্কই কেবল ছিল বোঝা যাচ্ছে, নইলে একখানা খাতা মাত্র সব কি ওল্টাতে পারে? তোমার এই ডায়েরী—আচ্ছা থাক্ থাক্—তুমিও অত লজ্জা পেও না। সগুণার কাছেই জেনো এর পরে সব। দিদির কৈফিয়তের চেয়ে সেই-ই ভাল হবে ভাই।"

এক জনের কথা মাত্র লিখতে বাকি—সে আমার সেই পিতৃস্নেহময় হৃদয়খানির কথা। যখন তিনি গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন, তাঁর ব্যথাকাতর মুখের দিকে চেয়ে দিদি ব'লে উঠলেন, "আমরাও আবার শীগ্‌গির যাচ্ছি কাকা আপনাদের কাছে।" কাকা অবাক্-ভাবেই তাঁর দিকে চাইছেন দেখে দিদি আবার বললেন,

"আপনার সগুণাকে আমি কিছুতেই ছাড়ছি না [illegible]বেন। কত বড় মেয়ে সে, আমি দেখব। আমার ভাজ তা'কে হ'তেই হবে। আমার তো একটি ভাই নয়—নীরেনও যে আমার আপন ভাই।"

কাকার ব্যাকুল দৃষ্টি ক'বারই সকলের মুখের উপর ঘুরে গেল দেখতে পেলাম। তার পরেই সেই শীর্ণ বুকের উপর আমার মাথাটা টেনে নিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন, "সগুণা, আমি একা যেতে পারব না—এত রাস্তা একা পারব না আমি,—নীরেন, চল তুমি আমার সঙ্গে। মা, বল তুমি।"

এ কথাটুকু দিদির দিকে চেয়েই বলেছিলেন। দিদি হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, "তাই হবে—যাও নারু! ফিরে এসে তার পরে—" সগুণাকে আশীর্ব্বাদের মতই বিদায় আ[illegible]ন ক'রে বললেন, "শীগ্‌গিরই দেখা হবে আবার ত।" [illegible] তাঁকে প্রণাম করতেই আমারও মাথা দিদির পায়ের ত[illegible] আপনি নত হ'য়ে পড়ল।